মহরমের ইতিবৃত্ত।

(কারবালা প্রান্তরে হোসেনের মানবলীলা সম্বরণ পর্য্যন্ত)

শ্রীকুমুদবন্ধু ঘোষ, বি. এ.
প্রণীত।

ঢাকা, আশুতোষ-যন্ত্রে
প্রিণ্টার শ্রীলছমন বসাক দ্বারা মুদ্রিত।
শ্রীরাজেন্দ্রলাল সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩০০

ভারতবর্ষীয়

সমগ্র মুসলমান ভ্রাতৃমণ্ডলীর

কর কমলে

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী

শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ

সাদরে

উৎসর্গী কৃত হইল।

১০ই ভাদ্র,
১৩০০

নিবেদন।

এই প্রবন্ধটী শ্রীযুক্ত মীর মশাররফ হোসেন সাহেব প্রণীত "বিষাদ-সিন্ধু" অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। ভাব ও ভাষার জন্য স্থানে স্থানে তাঁহার নিকট আমি বিশেষ রূপে ঋণবদ্ধ রহিলাম। "বিষাদ-সিন্ধু" হইতে গৃহীত অংশ সমূহ এই প্রবন্ধে মুদ্রণ জন্য অনুমতি প্রদান করিয়া মীর সাহেব আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমি তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। সহাধ্যায়ী যে সকল বন্ধুগণ ইহা পাঠ করিয়া স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়া দিয়াছেন তাঁহারাও আমার অকৃত্রিম ধন্যবাদের পাত্র।

উপসংহারে বিনীত নিবেদন, অজ্ঞতা বশতঃ ইহাতে যে সমস্ত ভ্রম প্রমাদ প্রবেশ করিয়াছে, সহৃদয় পাঠকগণ তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রদর্শন করিলে একান্ত বাধিত হইব।

ঢাকা,
১০ই ভাদ্র, ১৩০০। } বিনীত গ্রন্থকার।

অবতরণিকা।

মানব হৃদয়ের স্বভাব-দত্ত ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির উন্মেষ জন্য সময় সময় মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন, এই বাক্যটী ইতিহাসের একটী পরীক্ষিত সত্য। দেশ বিশেষ নানাপ্রকার ব্যভিচারে উৎসন্ন প্রায় হইলে সত্য স্থাপনার্থ, অহিতাচার নিবারণ জন্য, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা ইতিহাসজ্ঞ সকলেই স্বীকার করিবেন। দেশ, কাল, পাত্র ভেদে, এই মহাপুরুষদের কার্য্যক্ষেত্র ও জীবন বিচিত্র ঘটনাপুঞ্জে পরিপূর্ণ। সমদর্শী পণ্ডিতগণ মহাপুরুষ মাত্রকেই শ্রদ্ধা ও ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। কিন্তু এমন সংকীর্ণমনা গর্ব্বিত ব্যক্তিও আছেন যে, তাহারা স্ব সম্প্রদায় কি স্বজাতির মহাপুরুষ ভিন্ন, তত্তুল্য অপরকে মনুষ্যাধম, বিধর্ম্মী বলিতে ত্রুটি করেন না। এই শ্রেণীর লোক অতীব কৃপা-পাত্র। যে বুদ্ধদেবের নামে অদ্যাপিও জগতের এক তৃতীয়াংশ লোক মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছে, তাঁহাকে নাস্তিক চোর্ব্বি বলিয়া উপেক্ষা করিলে কোনও পৌরুষ বুদ্ধি

হয়না। যে খ্রীষ্টের নামে পৃথিবীতে আনন্দধ্বনি হয়,তাঁহার সদুপদেশ পূর্ণ বাক্য শ্রবণ মাত্র, কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলে যে কি ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়, জানিনা। মহাপুরুষ, বিশেষতঃ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাত্মাদের প্রতি যাহারা কোন রূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করে তাহারা মহা পাতকী।

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে মহাপুরুষের লক্ষণ বিভিন্ন রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সে লক্ষণগুলি অবগত না থাকিলেও পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষ নির্ণয় করা অতি সহজ। যখন সমসাময়িক প্রতাপান্বিত বলদৃপ্ত সম্রাটগণ বিস্মৃতির অতল সাগরে ডুবিয়া যান, এবং সামান্য বংশোদ্ভব তৎকালীন নগণ্য কোন এক ব্যক্তি মানব হৃদয়ের অতি উচ্চস্থানে আসন প্রাপ্ত হইয়া জগৎবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তখন স্বতঃই মনে হয়, যে শেষোক্ত ব্যক্তির মধ্যে এমন কিছু নিহিত আছে, যাহা সাধারণ্যে থাকিতে পারে না। যে পুরুষ শতাব্দী, সহস্রাব্দী অতীত হইলেও মানব হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করেন তিনিই প্রকৃত মহাপুরুষ। তাঁহার নামে যাহার মস্তক অবনত না হয় সে মনুষ্য নাম বাচ্য

নহে। এই শ্রেণীর মহাপুরুষের সংখ্যা জগতে অতি অল্প। ইহাদের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে পুণ্য হয়, নাম স্মরণ করিলে পাপ ক্ষয় হয়।

ইদানীন্তন মুসলমানগণ অধিকাংশই একেশ্বর বাদী। ইহাদের মধ্যে "একমেবাদ্বিতীয়ম" এই মহা সত্যটী দৃঢ়ভাবে অধিকার বিস্তার করিয়াছে। লোকের মন সাধারণতঃ সাকার উপাসনা ও প্রতিমা পূজায় আকৃষ্ট হয়। মুসলমানদের মধ্যে এই প্রকৃতি সুলভ ভাব পরিপুষ্ট হওয়ায়, তাহারাও নানা প্রকার কুসংস্কারময় পূজা প্রণালী অবলম্বন করিতেছিল। প্রকৃত ভগবানের অর্চ্চনা না করিয়া আরব দেশ যখন কল্পিত মূর্ত্তির উপাসনায় মগ্ন হইয়া দিন দিন নিম্নগামী হইতে ছিল, তখন সেই দেশে এক মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিধর্ম্মীদের সঙ্গে ধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, একাকী সংগ্রাম করিয়া অদ্বিতীয় ঈশ্বরের নাম জয় যুক্ত করিয়াছেন। তজ্জন্য মানব কুলের কত যে কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

সেই মহাপুরুষ কে? হজরত মহম্মদ। তাঁহার অদম্য তেজঃ, অলৌকিক বল, অলোকসামান্য

ঈশ্বরারাধনা জগতে অতুলনীয়। তাঁহার নাম করিলে হৃদয় তৃপ্ত হয়। এবং তাহার মহত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু প্রচার করিতে প্রয়াস জন্মে। কিন্তু মহাপুরুষ সম্বন্ধে কিছু লেখা কি বলা বড় সৌভাগ্যের কাজ। আমার তদনুরূপ বিজ্ঞতা ও চিত্ত শুদ্ধি নাই। সুতরাং হজরত মহম্মদের নাম মাত্র স্মরণ ও ভক্তি ভাবে তাঁহার উদ্দেশে মস্তক অবনত করিয়া, তাঁহার বংশে যে বিষাদময় ঘটনা স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল সংক্ষেপে তাহাই বর্ণনা করিব।

এতদ্দেশীয় সকলেই অবগত আছেন যে, মুসলমানদের মধ্যে "মহরম" একটী প্রধান পর্ব্ব। এই পর্ব্বোপলক্ষে মুসলমানগণ, স্ত্রী পুরুষ, আবাল বৃদ্ধ মত্ত হইয়া প্রতিবৎসর "হায় হাসেন! হায় হোসেন!" রবে বিষাদের রোল উত্থিত করিয়া, সর্ব্বদা বক্ষে করাঘাত করিয়া থাকেন। এই বিষাদময় ঘটনার মূল বৃত্তান্ত অধিকাংশ লোক, এমন কি মুসলমানগণও সকলে অবগত নহেন। এই নিমিত্ত অতি সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় উহার মূল বিবরণ প্রকাশ করিলাম। ইহা পাঠে কেহ উপকৃত হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

মহরমের ইতিবৃত্ত।

একদা মহাপুরুষ মহম্মদ শিষ্য সমূহে পরিবৃত হইয়া ধর্ম্মাসনে আসীন আছেন, এমন সময়ে সহসা তাঁহার বদন-কমল ঈষৎ নিষ্প্রভ হইল। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সন্দর্শন করিয়া শিষ্যগণ ব্যাকুল হইলেন। উহাদের মধ্যে মাবিয়া নামক একব্যক্তি অত্যন্ত ঈশ্বর পরায়ণ ধার্ম্মিক ছিলেন। সুতরাং মহম্মদ তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। প্রিয় শিষ্য মাবিয়া হজরত মহম্মদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "প্রভো, অকস্মাৎ আপনি কেন বিমর্ষ হইলেন? আপনার মলিন বদন দেখিয়া আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ত্বরায় বিষাদের কারণ প্রকাশ করিয়া হৃদয়-যন্ত্রণা দূর করুন।" প্রভু মহম্মদ এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন "উপস্থিত শিষ্য বর্গের মধ্যে কোন একজনের বংশধর আমার প্রিয় কন্যা ফাতিমার পুত্রদ্বয়কে বিনাশ করিয়া, মদিনার সম্রাট হইতে প্রয়াসী হইবে।"

মাবিয়া উত্তর শ্রবণ করিয়া অতি ব্যগ্র চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন "সেই প্রিয় শিষ্য কে ?" মহম্মদ তাঁহার আগ্রহাতিশয় নিবন্ধন উত্তর করিলেন "মাবিয়া আর কি বলিব, তুমিই সেই প্রিয় শিষ্য। তোমার ঔরসে এক সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবে সেই পুত্র হাসেন হোসেনকে বধ করিয়া মদিনার সিংহাসন অধিকার করিতে চেষ্টা করিবে।"

মাবিয়া হজরত মহম্মদকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিতেন। সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করিতেন। সুতরাং এই বাক্য শ্রবন করিয়া তিনি মর্ম্মান্তিক আহত হইলেন। মাবিয়া তখনও বিবাহ করেন নাই। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন "প্রভো, আমি এখনও পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হই নাই; চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মচারীর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিব। প্রাণান্তেও নারীজাতির মুখ সন্দর্শন করিব না। এইরূপ করিলে আমার ঔরসে সন্তান সম্ভাবনা কিরূপে হইবে ? অতএব বিষাদ ত্যাগ করুন।"

প্রভু মহম্মদ বলিলেন "মাবিয়া তুমি কি

জাননী যে সর্ব্ব শক্তিমান ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইবেই হইবে। যাঁহার কৌশলে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে, যাঁহার ইচ্ছায় গভীর সমুদ্র-তল, অভ্রভেদী শৈল-শৃঙ্গে পরিণত হইতেছে, আবার সেই গিরিচূড়া অতল সলিলে নিমগ্ন হইতেছে, যাঁহার ইঙ্গিতে একমুহূর্ত্তে কোটি কোটি জগতের ধ্বংশ ও নির্ম্মাণ সম্ভব, সেই বিশ্ব-শিল্পী ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতে বাধা জন্মায়, কাহার সাধ্য ? প্রিয় মাবিয়া, দুঃখিত হইওনা। মঙ্গলময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।”

এই ভবিষ্যদ্বাণীর কিয়দ্দিন পর মাবিয়ার এক রোগ জন্মে; তিনি রোগ-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া নানা প্রকার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। কিছুতেই উদ্বেগের শান্তি হয় না, দিন দিন পীড়া বৃদ্ধি হইয়া, যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। অতঃপর এই ব্যবস্থা হইল যে দার-পরিগ্রহ ভিন্ন এই রোগের উপশম হইবেনা। মাবিয়া প্রাণান্তে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন না। কারণ, সর্ব্বদাই তিনি প্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী চিন্তা করিতেন। তাঁহাদ্বারা প্রভুর বংশধরের বিনাশের সূচনা,

তিনি প্রাণান্তেও হইতে দিবেন না। এইরূপ সংকল্প করিয়া সকল প্রকার যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিলেন।

একদা হজরত মহম্মদ মাবিয়াকে বলিলেন, "আর কেন? ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা যে কোন উপায়ে হউক কার্য্যে পরিণত হইবেই। অতএব ব্যবস্থানুযায়ী কাজ করিয়া রোগ-যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ কর। আত্ম বিনাশ বাসনা ত্যাগ কর; আত্মহত্যা মহাপাপ।"

মাবিয়া প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য মানিয়া, উপস্থিত যন্ত্রণা এড়াইবার জন্য বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন। সচরাচর দৃষ্ট হয় যে অধিক বয়সে স্ত্রীলোকের গর্ব্ভধারণের শক্তি নষ্ট হয়। তজ্জন্য মাবিয়া অশীতিবর্ষীয়া একবৃদ্ধাকে বিবাহ করিলেন। অনন্তর অল্পদিন মধ্যেই তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন। বিধাতার বিধি কি অলঙ্ঘনীয়। সেই অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা অচিরে গর্ব্ভবতী হইলেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছুই অসম্ভব নয়। মানুষ যত চেষ্টাই করুক না কেন, সেই বিশ্বকৌশলীর কৌশল ব্যর্থ করে এমন সাধ্য কাহারও নাই।

যথা সময়ে মাবিয়া পত্নী, পুত্র প্রসব করিলেন। মাবিয়া তৎক্ষণাৎ সদ্যজাত শিশুকে বধ করিবেন সংকল্প করিলেন। মাবিয়া প্রভু প্রেমে এই নিষ্ঠুর ব্যাপারও সম্পাদন করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু পুত্র স্নেহের যে কি মোহিনী শক্তি, পুত্র-মুখ সন্দর্শন মাত্র স্নেহ রসে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। নিষ্ঠুর সংকল্প হৃদয় হইতে একবারে অন্তর্হিত হইল। তিনি সতৃষ্ণ নয়নে বার বার শিশুর মুখ-চন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। উচ্ছলিত হৃদয়-বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া প্রেমভরে অজস্র মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। প্রাণ সংহার করা দূরে থাকুক, আত্ম-প্রাণ পুত্রের জন্য তুচ্ছ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। দিন দিন পুত্র স্নেহ বৃদ্ধি পাইল। পিতা মাতার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া কালক্রমে মাবিয়া কুমার এজিদও যৌবনে পদার্পণ করিলেন।

যৌবন বিষম কাল, ভয়ঙ্কর সংগ্রামের সময়; এই সময়ে মানব হৃদয়ের সমস্ত প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া, প্রত্যেকে স্ব স্ব আধিপত্য বিস্তার করিবার নিমিত্ত, হৃদয় রাজ্যে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত

করে। সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তি দুইই সমান ভাবে যুবককে প্ররোচিত করিতে থাকে। যাঁহারা হৃদয়-রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিবেক বাণীর আজ্ঞাধীন হইয়া অসৎ প্রবৃত্তির উত্তেজনা দমন করিয়া, সৎ প্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করেন, তাঁহারাই ধন্য। তাঁহারাই যুদ্ধ জয়ী বীরনামে সাধু সমাজে পরিগণিত হন। যাহারা আত্ম-সংযম অভাবে প্রবৃত্তি-স্রোতে অবাধে শরীর মন অর্পণ করেন, দিন দিন তাহাদের অধোগতি হয়; এবং অবশেষে একবারে বিনাশ হয়।

দমস্ক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কোন এক নগরে জোব্বার নামে ভদ্রবংশসম্ভূত এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার অবস্থা মধ্যবিৎ ছিল। ধন সম্পত্তি যাহা ছিল তদ্দ্বারা সচ্ছল ভাবে সামাজিক আচার ব্যবহার রক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইতেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত অর্থ লোলুপ ছিলেন। নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বদা অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন। অর্থ লোভে সর্ব্বদা নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিতেন। অন্যের

সৌভাগ্য দর্শন করিয়া নিজকে ধিক্কার দিতেন। তিনি দেখিতে তত সুশ্রী ছিলেন না। তথাপি তাঁহার একমাত্র স্ত্রী জয়নাব তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। জয়নাব অতি সাধ্বী ও সুশীলা ছিলেন। তিনি পতিসেবাকে মোক্ষ সাধনের একমাত্র উপায় জ্ঞান করিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহারই শুশ্রূষা করিতেন। কিসে স্বামীর আনন্দ বর্দ্ধন হইবে, এই চিন্তাই সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক থাকিত। স্বামীর অবস্থাতে তিনি পরিতৃপ্তা থাকিয়া, তাঁহাকে বলিতেন, ঈশ্বর যাহাকে যে ভাবে রাখেন তাহাতেই প্রফুল্ল থাকা উচিত। তাঁহার বিচারে দোষার্পণ করা পাপ। যাহার যাহা প্রয়োজন ও মঙ্গলপ্রদ তাহা তাহাকে প্রদান করিতে তিনি কখনই ক্রুটি করেন না। অতএব কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহার দান গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। জয়নাব যেমন অসামান্যা ধার্ম্মিকা তেমনি রূপবতীও ছিলেন।

এজিদ যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়া একদা হঠাৎ জয়নাবকে দেখিলেন। দর্শন মাত্র তাঁহার হৃদয়ে জয়নাবের জন্য প্রণয় সঞ্চার হইল। তদ-

বধি জয়নাব মূর্ত্তি তাহার হৃদয়-পটে অঙ্কিত হইয়া রহিল। দিন দিন জয়নাব লাভ-বাসনা তাঁহার সর্ব্ব চিন্তা গ্রাস করিল। কিরূপে জয়নাব দর্শন পাইবে, কি উপায়ে সেই রমণী রত্ন হস্তগত হইবে, এই ভাবিতে ভাবিতে এজিদ দিন দিন মলিন ও ক্ষীণ হইয়া পড়িলেন।

পুত্র স্নেহ স্বভাবতঃই প্রবল। বৃদ্ধ বয়সে উহা অধিকতর প্রবল হইতে দেখা যায়। দমস্কাধিপতি বৃদ্ধ মাবিয়া ও তন্মহিষী পুত্রের ঈদৃশী অবস্থা অবলোকন করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। দমস্ক-রাজ-সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী, ধন জন কিছুরই অভাব নাই, তথাপি এরূপ বিষণ্ণ ভাব কেন, কোনরূপে নির্ণয় করিতে না পারিয়া, মাবিয়া পুত্রকে মনস্তাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। এজিদ পিতার নিকট মনোভাব প্রকাশ করিবার অবসর পাইয়াও উহা ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। অনেক প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু অন্তরের কথা মুখে প্রকাশ করিতে পারিলেন না। কেবল "জয়" শব্দটী উচ্চারণ করিলেন। আরো বলিলেন, "আমি, রাজ্য, ধন,

সম্মান কিছুরই অভিলাষী নই। আমার আশা পূর্ণ হইবার নহে।” মাবিয়া মহিষীর নিকট বলিলেন “অদ্য অনেক চেষ্টা করিয়াও এজিদের মনের প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার অনুমান হয় যে কোন মায়াবিনীর লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার এই শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে।

মহিষী অনেক অনুসন্ধান করিয়া এজিদের মনোভাব পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি স্বামিসদনে অতি কষ্টে মস্তক উত্তোলন করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন “এজিদ জোব্বার-পত্নী জয়নাবের মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়াই, তাঁহার জন্য পাগল হইয়াছে।”

মহিষীর বাক্য কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র ধর্ম্মগত-প্রাণ মাবিয়া রোষভরে বলিলেন “এজিদের জীবন মৃত্যু দুইই সমান। পরস্ত্রীর প্রতি কুভাবে যে একবার দৃষ্টি করিবে, কি কোন রূপ কুভাব মনে পোষণ করিবে ঘোর নরকেও তাহার স্থান হইবে না। এজিদ প্রাণত্যাগ করিতে চায় করুক; তাহার মৃত্যুতে মাবিয়া বিন্দুমাত্রও শোকাশ্রুপাত করিবে না।”

এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া মহিষী বিনয়-নম্র বচনে বলিলেন "যদি এজিদ প্রাণ পরিত্যাগ করে, তবে এজীবনেও রাজৈশ্বর্য্যে ফল কি ?" বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে এজিদ যে ভালবাসায় উন্মত্ত হইয়াছে, উহা মানব-হৃদয়ে স্বতঃই উদিত হয়। উহা শিক্ষা-সাপেক্ষ নহে। কত কত জ্ঞানী ব্যক্তি উহার কুহকে পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। রক্তমাংসধারী ব্যক্তিমাত্রের হৃদয়েই ভালবাসা আছে। যে হৃদয় প্রেম-শূন্য, তাহা শুষ্ক মরুভূমি ও দগ্ধ শ্মশান-ক্ষেত্র। অতএব যাহাতে ধর্ম্মরক্ষা হইয়া, এজিদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা করিতে পারিলে ক্ষতি কি ?" মাবিয়া বলিলেন "মহিষি, ভালবাসা-বিবর্জ্জিত প্রেম-শূন্য হৃদয় হৃদয়ই নয়। কিন্তু এজিদ যে প্রেমে মত্ত, সে প্রেম নয়, প্রেমের বিকার। ধর্ম্ম-শাস্ত্র-শাসন লঙ্ঘন না করিয়া প্রাণাধিক পুত্রের প্রাণরক্ষা করিতে পারিলে, আমি কোন প্রকার বাঁধা জন্মাইব না। সর্ব্বদিক রক্ষা করিয়া এজিদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিলে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হয়। এজিদও প্রাণে বাঁচে, আমিও

নিশ্চিন্ত মনে ঈশ্বর উপাসনা করিতে পারি।”

মাবিয়া এইরূপ অনুকূল ভাব প্রকাশ করিবামাত্র, এজিদ অতি-ত্রস্ত ভাবে, বিশেষ সতর্কতার সহিত, আবদুল জোব্বারকে, রাজধানীতে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত এক পত্র লিখিয়া, তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। পত্রে প্রধান উজীর মরিয়ানের দস্তখত ছিল।

দ্রুতগতি নিবন্ধন দূত ব্যস্ত ও অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া মধ্যাহ্ন সময়ে জোব্বার-নিবাসে উপস্থিত হইলেন। অর্থ-লোভী জোব্বার তাঁহার ব্যবসায়ের হিসাবপত্র সংগ্রহ করিতেছেন, অর্থাগমের নানাবিধ কৌশল চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার এক আত্মীয় সংবাদ দিলেন যে, দমস্কাধিপতির আদেশ-পত্র সহ এক দূত তাঁহার অনুসন্ধান করিতেছেন। এই বার্ত্তা শুনিয়া তিনি শশব্যস্তে বহির্দ্বারে আসিলেন। রাজ-দূত সসম্ভ্রমে তাঁহার হস্তে পত্র-প্রদান করিলেন। জোব্বার তাহা পাঠ করিয়া নিজকে শ্লাঘ্য মনে করিলেন। আমি এমন কি পুণ্য কার্য্য করিয়াছি যে স্বয়ং দমস্কাধিপতি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা

করিয়াছেন। "জয়নাব, আমি এখনই চলিলাম।" এই বলিয়া স্ত্রীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাজসভায় গমনোপযোগী তাঁহার যে কিছু বেশ ভূষা ছিল সংগ্রহ করিয়া, লোকজন সমভিব্যাহারে রাজধানীতে গমন করিলেন। জয়নাব বাষ্প পরিপূর্ণ লোচনে জোব্বারকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অর্থ-পিশাচ জোব্বার উল্লাসে এত বিহ্বল হইয়াছিলেন যে গমনকালে পতি-প্রাণা সতী জয়নাবকে কোনরূপ সান্ত্বনা করিলেন না।

এদিকে, কি উপায়ে জয়নাব লাভ হইবে এজিদ প্রধান মন্ত্রী মরিয়ানের সহিত সর্ব্বদা তাহার পরামর্শ করিতেছেন। মরিয়ানই তাঁহার বুদ্ধি, বল, সাহস, সম্পদ ছিলেন। সময়ে অসময়ে তাঁহার সহিতই পরামর্শ করিতেন। ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ না হইলে মাবিয়া কোন কার্য্যে বাঁধা দিবেন না, এই সূত্র অবলম্বন করিয়া মরিয়ান এক উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি এজিদকে বলিলেন "সে উপায়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে নরহত্যার পাপে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন কি?"

উভয়ে এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, ইত্য-

বসরে হঠাৎ আগমনীয় বাদ্যধ্বনি হইল, এজিদ-মনে করিলেন জোব্বারের শুভ আগমনেই এই বাদ্যধ্বনি। সুতরাং তাঁহারা ব্যগ্রতার সহিত সম্রাট মাবিয়ার আনন্দমন্দিরে উপস্থিত হইলেন। জোব্বার যথারীতি মহারাজকে অভিবাদন করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। পুত্রের পরামর্শ মত মহিষী মহারাজকে যেরূপ করিতে বলিয়াছিলেন মাবিয়া তদ্রূপ করিলেন। তিনি কিয়ৎকাল আলাপের পর জোব্বারকে বলিলেন "আমার মনোগত অভিপ্রায় মরিয়ান তোমাকে জ্ঞাপন করিবেন।" এই বলিয়া সেই দিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়া ভজনালয়ে গমন করিলেন।

মরিয়ান মহারাজের প্রতিনিধি হইয়া বলি-লেন "হে মাননীয় জোব্বার সাহেব আমাদের ইচ্ছা যে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয়োপযোগী সম্পত্তি প্রদান পূর্ব্বক, রাজকুমারী সালেহাকে আপনার সহিত শুভ-পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করি। এবং আপনি স্থায়িভাবে এখানে বাস করেন।" এজিদ ভিন্ন মাবিয়ার অন্য কোন সন্তান ছিলনা, সালেহা মরিয়ানের কল্পনা-প্রসূতা রাজকুমারী মাত্র।

আশাতীত সম্মান ও সহসা ধনসম্পত্তি লাভের প্রস্তাবে জোব্বার এরূপ আনন্দিত হইলেন যে ক্ষণকালের জন্য তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। আনন্দের আতিশয্যহেতু তাঁহার বাকরোধ না হইলে, তখনই সম্মতি প্রদান করিতেন। ক্ষণকাল পরে বাকশক্তি প্রাপ্ত হইয়া উত্তর করিলেন "মন্ত্রি-বর, আমার পরম সৌভাগ্য, মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য।"

মরিয়ান ও এজিদ পূর্ব্বাবধি জোব্বারকে প্রতারিত করিবার জন্য কৌশল জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিলেন। জোব্বার যেমন সম্মতি-সূচক ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তৎক্ষণাৎ এজিদের ইঙ্গিতে মরিয়ান, পুরোহিত অমাত্য পরিজন সমূহ উপস্থিত করাইলেন। মুসলমানদের প্রথানু-সারে, পুরোহিতের আদেশ মতে, এজিদ পাত্রী-পক্ষের প্রতিনিধি নির্দ্ধারিত হইলেন। মরিয়ান ও অপর এক ব্যক্তি সাক্ষী নিযুক্ত হইলেন।

পাত্রীর স্বীকার বাক্য স্বকর্ণে শ্রবণ করিবার জন্য সাক্ষীসহ প্রতিনিধি এজিদ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে, বিবাহ সভায় উপস্থিত

হইয়া সভ্যগণকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন, "বিবি সালেহা এ বিবাহে অসম্মত নহেন। কিন্তু, তিনি পরম্পরায় অবগত হইয়াছেন যে জোব্বারের জয়নাবনামে অন্যতমা ভার্য্যা আছেন। তাঁহাকে ত্যাগ না করিলে, শাস্ত্রানুসারে, তিনি এ বিবাহে মত দিতে পারেন না।"

অর্থ ভিন্ন সংসারে কোনকার্য্য সম্পন্ন হওয়া দুষ্কর। সুখ মানবমাত্রেরই স্পৃহনীয়। একমাত্র না হইলেও, অর্থই উহার প্রধানতম সাধন। অনেকে মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া, উহার সাধনকেই চরম লক্ষ্য মনে করেন। অর্থ-পিপাসুদের মধ্যে ইহা সচরাচরই পরিলক্ষিত হয়। তাহারা অর্থের জন্য এত লালায়িত হন যে উহার নামে তাহারা না করিতে পারেন এমন দুষ্কর্ম্ম নাই। জোব্বার এই শ্রেণীর লোক। সালেহাকে বিবাহ করিবেন, বহুল অর্থ লাভ করিতে পারিবেন, রাজোচিত সম্মান প্রাপ্তি হইবে, এ সকল ভাবিয়া এজিদের বাক্যাবসানে, ক্ষণমাত্র চিন্তা নাকরিয়া, পতিপ্রাণা সাধ্বী নিরপরাধিনী জয়নাবকে অম্লান বদনে পরিণয়-শৃঙ্খল হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন। ধন্য

অর্থ ! তোমার কুহকে যে মজিয়াছে তাহার নিকট পুত্রস্নেহ, পিতৃভক্তি, স্বর্গীয় দাম্পত্যপ্রেম সকলই তুচ্ছ ! ! !

প্রতিনিধি এজিদ সাক্ষীসহ পুনরায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কিয়ৎকালানন্তর সভায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং উপস্থিত ভদ্র মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যে ব্যক্তি অর্থলালসায় সতী সাধ্বী সহধর্ম্মিণীকে অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারে, যে বহুদিনের প্রেম, ভালবাসা মুহূর্ত্তে ভুলিয়া, পবিত্র প্রেম বন্ধন অকাতরে ছিন্ন করিতে পারে, এমন নির্ম্মম অর্থপিশাচ, বিশ্বাসঘাতককে আত্ম-সমর্পণ করিতে সালেহা স্বীকৃতা নহেন।"

এজিদের বাক্য শ্রবণ করিয়া জোব্বার একবারে স্তম্ভিত হইলেন। শত শত অশনি যেন এককালে তাঁহার মস্তকে পতিত হইল। সমস্ত আশা একবারে নিঃশেষ হইল। মহাদুঃখিত হইয়া রাজ-দত্ত পরিণয়-পরিচ্ছদাদি পরিত্যাগ করিলেন। সামান্য ভিখারীর বেশে রাজ-প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে

লাগিলেন। গৃহে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না।

কুকথা প্রচারিত হইতে অধিক বিলম্ব হয় না। অতি অল্পকাল মধ্যেই জয়নাব ও তাঁহার প্রতিবেশীবর্গ এই শোকবার্ত্তা ও জোব্বারের বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ অবগত হইলেন। জয়নাব কখনও বিশ্বাস করেন, কখনও সন্দিহান হইয়া উপেক্ষা করেন। কিন্তু প্রকৃত সংবাদ যথার্থরূপে জ্ঞাত হইয়া, তিনি একবারে বিষাদ-সাগরে নিমগ্না হইলেন। অতি মলিনবেশে ও শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন।

এজিদ ও মরিয়ানের কৌশলক্রমে জোব্বার প্রতারিত হইলেন, জয়নাব পরিত্যক্তা হইলেন। এজিদের আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল। মুসলমানদের জাতীয় প্রথানুসারে পতিবর্জ্জিতা স্ত্রীকে তিন মাস বৈধব্যব্রত পালন করিতে হয়। এই সময়ে তিনি সামান্য বস্ত্র পরিধান করেন, নিয়মিত আচার অবলম্বন করিয়া মৃত্তিকায় শয়ন করেন, সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক কোন প্রকার অঙ্গরাগ ব্যবহার করেন না। জয়নাব শাস্ত্র-শাসনানুযায়ী বৈধব্যব্রত পালন করিতে লাগিলেন।

এজিদ জয়নাব-চিন্তায় আত্ম-হারা হইয়াছি-লেন। মাবিয়া তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়াই স্বীয় ভার্য্যার অনুরোধে বিধিমতে জয়নাব-প্রাপ্তির চেষ্টা করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু মরিয়ান যে চাতুরী-জাল বিস্তার করিয়া জোব্বারের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, তাহার বিন্দুমাত্রও তিনি জানিতে পারেন নাই। জয়নাব পরিত্যক্তা হইয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া মাবিয়া মোসলেম নামক এক ব্যক্তিকে এজিদের বিবাহ-প্রস্তাব সহ জয়নাবের নিকট প্রেরণ করিলেন। মোসলেম প্রভুর আজ্ঞা-নুসারে দ্রুতপদে জয়নাব-ভবনে গমন করিলেন। একে মরুভূমি, তাহাতে প্রখর সূর্য্যোত্তাপ; সংবাদ বাহক পথ-শ্রান্তিতে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম করি-তেছেন, এমন সময়ে আব্বাস নামক এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। আব্বাস মোসলে-মের দৌত্য-কার্য্যের আমূল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন “ভাই, প্রথমে এজিদের প্রস্তাব জানাইয়া শেষে ধর্ম্মশীলা সুশীলা জয়নাবকে আমার প্রার্থনা জানাইও। আমি তাঁহার পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া তোমাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলাম।”

মোসলেম ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া আবার চলিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন হজরত মহম্মদের দৌহিত্র মাননীয় এমামহাসেন সশস্ত্র মৃগয়া করিতে বহির্গত হইয়াছেন। তিনি তৎকালে মদিনার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। মোসলেম তাঁহার বাল্য-সখা। তাঁহাকে দর্শন করিয়া হাসেন অত্যন্ত প্রীত হইয়া আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত দূর হইতে হস্ত প্রসারণ করিলেন। মোসলেম অবনত মস্তকে ধার্ম্মিকপ্রবর হাসেনের পদচুম্বন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। হাসেন, তাঁহার ঈদৃশ বিনয়-নম্র-ভাব দেখিয়া বলিলেন "এত কেন? তুমি আমার বাল্য-সুহৃদ। তুমি এখন কোথায় যাইতেছ?" মোসলেম গমন-প্রয়োজন প্রকাশ করিলে পর, হাসেন হাস্য করিয়া বলিলেন "ভাই, প্রথমে এজিদের, তৎপর আক্কাসের প্রস্তাব জানাইয়া, অবশেষে এই গরিবের প্রার্থনাও জ্ঞাপন করিও। আমি তাঁহার পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া তোমাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলাম।"

কোমলবুদ্ধি রমণীগণের মন বাহ্য চাকচিক্যে সহজেই প্রলুব্ধ হয়। অর্থাভিলাষ তাঁহাদের মধ্যে কম প্রবল নয়। রূপের মোহেও অনেক স্থলে তাহাদিগকে মুগ্ধ হইতে দেখা যায়। পরিণয় প্রার্থীগণের মধ্যে এজিদ ধনসম্পত্তিতে ও রূপে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আব্বাস ও যেমন ধনবান তেমনি সুরূপ। হাসেন যদিও মদিনার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার বাহ্যিক কোন আড়ম্বর নাই, ধর্ম্মকার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকেন। ঈশ্বর চিন্তা, তাঁহার পূজা ভিন্ন হাসেন-গৃহে সুখ বিলাসের অন্য উপকরণ নাই। এইরূপ অবস্থায় জয়নাব কাহার প্রস্তাব গ্রহণ করেন, কে বলিতে পারে?

কিন্তু জয়নাব সামান্যা রমণী নন। তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমতী, সতী, পতিপ্রাণা ধার্ম্মিকা স্ত্রী জগতে দুর্ল্লভ। মোসলেম যথা সময়ে তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়া একে একে তিন জনের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। প্রভু মহম্মদের দৌহিত্র, ধার্ম্মিক প্রবর এমাম হাসেনের প্রস্তাব তিনি সর্ব্বাগ্রগণ্য বিবেচনা করিলেন। তিনি

মোসলেমকে বলিলেন "বড় লোকের মন বড় আশা বড়, তাঁহাদের সকল কার্য্যই আড়ম্বর বিশিষ্ট। অথচ সকলই বালির বাঁধের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। বিশ্বাসের ভাগ অল্প। রাজ-প্রাসাদ বিষয়-বিভবের আকাঙ্ক্ষী আমি নহি। সাধু পুরুষদের কৃপা কটাক্ষে, শত শত পাপ দূর হইয়া, পাপিগণ পূত ও স্বর্গে নীত হয়। প্রভু হাসেন যখন আমাকে দাসীত্বে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন আমার ন্যায় ভাগ্যবতী নারী জগতে কত জন আছেন? বৈধব্য-ব্রত পূর্ণ হইলেই আমি তাঁহার পবিত্র চরণ-প্রান্তে আত্ম-সমর্পণ করিব। অন্য কোন প্রার্থীর কথা মনেও স্থান দিবনা।"

এদিকে মাবিয়া অতিশয় পীড়িত। জীবনের আশা অতি অল্প। এজিদ মুহূর্ত্তের জন্যও পিতার অবস্থা ভাবেন না। তাঁহার সেবা শুশ্রূষাতে মন নাই। কেবল জয়নাবের বদন-কমলের লাবণ্য, তাঁহার রমণীয় মুখাকৃতি মনে মনে চিন্তা করেন। মোস্লেম কখন প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, সেই সময় প্রতীক্ষা করিয়া দিন গণনা করিতেছেন। এক দিন

এজিদের পক্ষে এক বৎসরের ন্যায় সুদীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল। মোসলেম জয়নাবের নিকট কি প্রকারে প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, জয়নাব কি ভাবে উহা গ্রহণ করিলেন, মোসলেমকে সেই সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবেন; প্রথম সাক্ষাতের দিন জয়নাবকে কি বলিয়া সম্বোধন করিবেন; এই সমস্ত ভাবনাই তাঁহার মস্তিষ্ক আন্দোলিত করিতেছিল। আশার কুহকে, পরিণয় অবশ্যম্ভাবী স্থির করিয়া, এজিদ মোসলেমের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার মাতার প্রধানা পরিচারিকা ত্রস্তে আসিয়া বলিল "দমস্কাধিপতি আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন, শীঘ্র আসুন।"

এজিদ শশব্যস্তে পিতৃ-ভবনে যাইয়া দেখিলেন মাতা শয্যার পার্শ্বে বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছেন। এজিদ সসম্ভ্রমে মাতাকে প্রণাম করিয়া পিতৃ-সন্নিধানে উপবেশন করিলেন। মাবিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন "মোসলেম ফিরিয়া আসিয়াছেন, জয়নাবের বুদ্ধিকে আমি শত শত বার প্রশংসা করি। এমন ধর্ম্মপরায়ণা, সতী, সাধ্বীর নাম করিলে পুণ্য হয়। এজিদ, তুমি যে হাসেন হোসেনের নামে ক্রোধে

জ্বলিয়া উঠ, স্ত্রী-বুদ্ধি প্রভাবেও, জয়নাব তাঁহাদের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া হাসেনের বিবাহ-প্রস্তাব অতি সমাদরে ও হৃষ্টমনে গ্রহণ করিয়াছেন। এখনও বলি, তাঁহাদের প্রতি ক্রোধ করিওনা, বিদ্বেষ ভাব ত্যাগ কর। সত্যপথ, ধর্ম্মপথ অবলম্বন কর; আমি যেরূপ দাসত্ব অবলম্বন করিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা অধিকতর বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহাদের পদ-প্রান্তে শরণ লও। তোমা অপেক্ষা তাঁহারা সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ।

মাবিয়ার বাক্যে এজিদের বক্ষ যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। শত শত আকাশ যেন তাঁহার মস্তকে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকল আশা ব্যর্থ হইল, মহাশোকে শরীর মন জর্জ্জরিত হইল। শোকে দুঃখে অধীর হইয়া পিতার বাক্য অমান্য করিয়া এজিদ বলিলেন "আমি দমস্কের রাজপুত্র, ধন, জন, সৈন্য সামন্ত কিছুরই অভাব নাই। সর্ব্ববলে আমি বলীয়ান। আমি যাহার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, যাহার জন্য কত কষ্ট সহ্য করিয়াছি, সেই জয়নাবকে হাসেন বিবাহ করিবেন, এজিদ জীবিত থাকিতে তাহা সহ্য করিবে না। যে হাসেনের

কিছুমাত্র সঞ্চিত অর্থ নাই, উপবাস, ব্রত, সংযম যাহার বংশের চিরপ্রথা, সেই হাসেনকে এজিদ মান্য করিবে? মান্যকরা দূরে থাকুক, এজিদ তাহাদিগকে, জয়নাব-রত্নাপহরণের প্রতিশোধ এবং শাস্তি অবশ্যই দিবে। এই আমার প্রতিজ্ঞা।”

মহম্মদ-ভক্ত ঈশ্বর-প্রেমিক মাবিয়া পুত্রের ঈদৃশ মর্ম্মান্তিক বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহাকে বিবিধ প্রকারে ভর্ৎসনা করিলেন। এজিদ ম্লান মুখে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। মাবিয়া মৃত্যুকে শত শত বার শ্লাঘ্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। দুই হস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া “আমাকে উদ্ধার কর” বলিয়া ঈশ্বর সমীপে সকাতরে প্রার্থনা করিলেন।

সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করেনা। দিনের পর দিন অতীত হইল, ক্রমে জয়নাবের বৈধব্য-ব্রতের নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইল। শুভদিনে হাসেন জয়নাব-ভবনে গমন করিয়া শুভক্ষণে উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে হাসনেবানু ও জায়েদা নামে হাসেন অপর, দুই মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া-

ছিলেন। প্রধানা পত্নী হাসনেবানুর গর্ভে আবুল কাসেম একমাত্র পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। জায়েদা নিঃসন্তান। এক বস্তুর দুই প্রার্থী হইলে, প্রার্থীদের মধ্যে সর্ব্বত্রেই বিদ্বেষভাব দৃষ্ট হয়। বিশেষ সপত্নী-বিদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। জায়েদা প্রথমাবধি হাসনেবানুর সহিত বিরোধ করিতেন। কিন্তু তিনি প্রধানা মহিষী ছিলেন, সুতরাং জায়েদা তাঁহার সহিত কোনও ক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করিতে পারিতেন না। কিন্তু, জয়নাবের সহিত তিনি বিশেষ প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিলেন। যদিও সমদর্শী হাসেন সকলকেই সমান ভাবে প্রেম করিতেন, তথাপি জায়েদা ভাবিতেন, তিনি জয়নাবেই অধিকতর অনুরক্ত। এবং এই ভাব ক্রমে ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে চলিল। জয়নাবকে তিনি বিষ-নয়নে দেখিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে জয়নাব, তাঁহাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় জ্ঞান করিয়া, তদুচিত সম্মান করিতেন। স্বামীর অকপট, অপরিবর্ত্তিত ভালবাসা, জয়নাবের যথোচিত সম্মান, কিছুতেই জায়েদার মন উঠিল না। দিন দিন হাসেনকেও শত্রু-ভাবে

দেখিতে আরম্ভ করিলেন। জয়নাব-লাভ করিয়া হাসেন চিরশত্রু এজিদের রোষাগ্নি বৃদ্ধি করিলেন। গৃহাভ্যন্তরে জায়েদাও তাঁহার পরম শত্রু হইয়া উঠিলেন।

মাবিয়া এজিদের উদ্ধত বাক্য শ্রবণাবধি মর্ম্মাহত হইয়া পুত্রমুখ দেখিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। সেই সময় হইতে দিন দিন পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এখন তিনি নিজে গাত্রোত্থান করিতে পারেন না। শমন নিকটবর্ত্তী দেখিয়া মনে মনে স্থির করিলেন দমস্করাজ্য হাসেন হোসেনকে প্রদান করিবেন। এই সঙ্কল্প করিয়া তাঁহাদের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দূত এজিদের চক্রান্তে পথিমধ্যেই নিহত হইল। হাসেন হোসেন আসিতেছেন না দেখিয়া, মাবিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া, প্রধান মন্ত্রী হামানকে বলিলেন "হাসেন হোসেন না আসার কারণ নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। অতএব চিরবিশ্বাসী, বহুদর্শী মোসলেমকে, "আমার আর জীবনের আশা নাই। অন্তিম কালে আপনাদিগকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করি। দমস্করাজসিংহাসনে আপনাদিগকে

উপবিষ্ট দেখিয়া জীবন সার্থক করিব।” এইরূপ একখানা প্রার্থনাপত্রসহ অতি গোপনে পুনরায় মদিনায় প্রেরণ কর।”

এজিদ প্রচ্ছন্ন থাকিয়া হামানকে মাবিয়া যাহা যাহা বলিলেন তৎসমুদায় আদ্যোপান্ত শুনিলেন। মোসলেম পত্রসহ মদিনায় প্রেরিত হইলেন। দ্রুতগতিতে অবিশ্রান্ত চলিতেছেন, এমন সময়ে কয়েকজন অস্ত্রধারী পুরুষ ছদ্মবেশে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তিনি অসি নিস্কোষিত করিয়া তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অস্ত্র-সঞ্চালন কৌশল দেখিয়া অস্ত্রধারীগণ কেহই অগ্রসর হইলেন না। অবশেষে এজিদ মুখাবরণ দূর করিয়া বলিলেন “মোসলেম তুমি কি করিতেছ?” প্রভু-পুত্রকে দেখিবামাত্র মোসলেম তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। এজিদ তাঁহার অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লইলেন। মাবিয়ার পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন; এবং আদেশ করিলেন “যত দিন পিতার মৃত্যু না হয়, তত দিন তুমি বন্দীভাবে নির্জ্জন কারাবাস ভোগ করিবে।” এই আদেশ

হইবামাত্র লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া মোসলেম কারাগারে নীত হইলেন।

মাবিয়ার পীড়া বৃদ্ধি হইতে হইতে, অবশেষে সমস্ত মৃত্যু লক্ষণ দেখা দিল। তদ্দর্শনে সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইলেন। আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে মাবিয়াও ক্ষীণকণ্ঠে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। এজিদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। পিতার মৃত্যুতে এজিদ দুঃখিত হইলেন না। কখনও পিতার জন্য এক বিন্দু শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন না। এজিদ যথারীতি পিতার মৃত দেহের সৎকার করিয়া, পৈতৃক সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন।

এজিদ রাজা, মরিয়ান মন্ত্রী। রাজ্যের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সকলেই উদ্বিগ্ন হইলেন। সিংহাসন আরোহণ করিয়াই এজিদ যথেচ্ছভাবে স্বীয় ক্ষমতা পরিচালন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমেই মোসলেমের বিচার। দমস্ক রাজ্য

হাসেন হোসেনকে প্রদান করিবার জন্য মাবিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্র বাহক মোসলেম এজিদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া রাজদ্রোহী হইয়াছে; এবং জয়নাবের নিকট হাসেনের বিবাহ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। এই দুই গুরুতর অপরাধ তাঁহার স্কন্ধে অর্পণ করিয়া প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিলেন। মাবিয়ার চির-বিশ্বাসী প্রিয়তম ভৃত্য মোসলেমের প্রতি ঈদৃশ নিষ্ঠুর আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া সভাস্থ ব্যক্তিমাত্রই দুঃখিত হইলেন। প্রাণভয়ে সকলেই দুঃখ অন্তরে রাখিয়া রাজ্যের পরিণাম চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এজিদ এখন রাজপুত্র নন। স্বয়ংই দমস্ক রাজ্যের রাজা। তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতায় বাঁধা দেয়, এরূপ সাহস কি সাধ্য কাহারও নাই। কোষা-গার ধনে পূর্ণ, সৈন্য সামন্তের অভাব নাই; মহা গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া এজিদ চিরশত্রু হাসেন হো-সেনের বিনাশ সংকল্প করিয়া, তাঁহাদের প্রতি এক আদেশ প্রচার করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে তাঁহারা অচিরে দমস্ক-রাজের পদানত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করেন, নতুবা তাঁহাদের মঙ্গল

নাই এরূপ আদেশপত্রসহ মদিনা নগরে এক দূত প্রেরিত হইল।

হাসেন হোসেন লোক পরম্পরায় মাবিয়ার উৎকট রোগবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য মদিনা হইতে দমস্ক যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু, পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া, দুঃখিত হৃদয়ে তথা হইতেই স্বীয় স্বীয় ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এজিদ-প্রেরিত দূত যথা সময়ে, তাঁহার আদেশপত্রসহ, মদিনায় উপস্থিত হইয়া সসম্ভ্রমে উহা হাসেনকে প্রদান করিলেন। হাসেন পত্র পাঠ করিয়া কি করিবেন কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, স্বীয় অমাত্যবর্গ ও প্রাণপ্রতিম সহোদর হোসেনের সহিত পরামর্শ করিবার নিমিত্ত, সকলে মিলিয়া প্রভুর সমাধি-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। (যখন কোন গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইত, তখনই কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ জন্য মাতামহ প্রভু মহম্মদের সমাধি-প্রাঙ্গনে যাওয়ার রীতি ছিল।) তথায় সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, এজিদ পাগল হইয়াছে। কেহ

বলিলেন পাপমতি মরিয়ানের মন্ত্রণানুসারে এজিদ এরূপ স্পর্দ্ধান্বিত হইয়াছেন। হাসেন বলিলেন "যে কারণেই এরূপ উদ্ধত হউক, পত্র ফিরাইয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য।" কনিষ্ঠ হোসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলিলেন "আপনারা যাহাই বলুন, যাহাই কর্ত্তব্য স্থির করুণ, পত্র খানা সুধু প্রত্যর্পণ করা আমার ইচ্ছা নয়। যে পূজ্যপাদ পিতা আলীর নামে দমস্করাজ্য কম্পিত হইত, আমরা সেই বীরবরের বংশধর হইয়া এত স্পর্দ্ধা ও এত অপমান সহ্য করিব? হাসেন ভ্রাতাকে বিবিধ প্রকারে প্রবোধ দিয়া বলিলেন "আমরা অগ্রে কিছুই করিবনা। পত্রের উত্তরও দিবনা; দেখি এজিদ কোন্ পথ অবলম্বন করে।" হোসেন ভ্রাতৃ-আজ্ঞা পালন করিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার ক্রোধের শান্তি হইল না। ভ্রাতার হস্ত হইতে পত্রখানা লইয়া দূতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "পাপাত্মা এজিদ যে পত্র দিয়া তোমাকে মদিনায় পাঠাইয়াছে; ইহার প্রতি অক্ষরে শতশত পাদুকাঘাত করিলেও আমার ক্রোধের অনুমাত্র উপশম হয়না। ধর্ম্ম-গ্রন্থে যে সমস্ত অক্ষর আছে; ইহাতেও

তাহা সন্নিবেশিত আছে মনে ভাবিয়াই তাহা করিলাম না।" পত্রখানা খণ্ড খণ্ড করিয়া দূত-হস্তে প্রদান করিলেন। "এই নেও এজিদের পত্রোত্তর; আর আমি যাহা যাহা বলিলাম অবিকল তাহাকে জ্ঞাপন করিও।" এই বলিয়া এজিদের দূতকে বিদায় দিলেন। এজিদ বৈর-সাধন-বাসনা তৃপ্তি করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিলেন। যেরূপ আজ্ঞাসহ দূত মদিনায় গিয়াছে, তাহাতে প্রাণসহ প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, এজিদের এরূপ আশা ছিলনা। সুতরাং, যুদ্ধের সাজ সজ্জা করা হইল। এজিদ স্বীয় সৈন্য দুই দলে বিভক্ত করিয়া তাহাদের অস্ত্রচালনা, ব্যূহরচনা বিষয়ে সমর-নৈপুণ্য দেখিয়া পরম উল্লাসিত ও আশান্বিত হইলেন। হাসেন হোসেনত দূরের কথা, সুপ্রসিদ্ধ বীর আলি যদি স্বয়ং সমাধি মন্দির হইতে উত্থিত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, তথাপি এই সমস্ত সমর-বিশারদ যোদ্ধৃবর্গ পরাভূত হইবে না। এই প্রকারে এজিদ আত্মবলের প্রশংসা করিতেছেন, এমন সময়ে দূত আসিয়া মদিনার আনুপূর্ব্বিক অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন।

একে যৌবন কাল, তাহাতে অর্থ, আত্মম্ভরিতা পৃষ্ঠপোষক; দূত-মুখে হোসেনের আচরণ-বিবরণ শ্রবণ করিয়া এজিদ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। অধীরচিত্তে সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আর ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া তোমরা এই মুহূর্ত্তে মদিনাযাত্রা কর। হাসেনহোসেনবধে এখনই অগ্রসর হও। যে অনতিবিলম্বে হাসেনের দেহ-বিচ্ছিন্ন মস্তক আমাকে দেখাইতে পারিবে, তাহাকে লক্ষ টাকা পুরস্কার দিব।" সৈন্যগণকে এবম্বিধ বাক্য দ্বারা উত্তেজিত করিয়া মরিয়ানকে সম্বোধন করিয়া এজিদ বলিলেন "মরিয়ান, তুমি আমার সম্বল, বুদ্ধি, সাহস, এবং সম্পদ। অদ্য তোমাকেই সেনাপতিপদে বরণ করিয়া সংগ্রামে প্রেরণ করিব। হাসেনহোসেন সংহার করিতে পারিলে দমস্কাধিপতির ধন-ভাণ্ডার তোমাদের নিকট অবারিত থাকিবে। পরাভূত হইলেও নিরুৎসাহ হইওনা; ছলে বলে, কি কৌশলে, যে উপায়েই হউক হাসেনের প্রাণসংহার না করিয়া, দমস্করাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিও না।" তাহাদিগকে এইরূপে উত্তেজিত

করিয়া নগরপ্রান্ত পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। তৎপর সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

যে অবধি এজিদের পত্রমর্ম্ম মদিনাবাসিগণ অবগত হইয়াছেন, তদবধি আবাল বৃদ্ধ সকলেই, হাসেনের অপমানজনিত ক্রোধে নূতন ভাব ধারণ করিয়াছেন। সকলের মুখাকৃতিতেই রোষাগ্নি প্রতিভাত। সকলেই এজিদের নামে শত শত ধিক্কার দিতেছেন। দেহে একবিন্দু শোণিত থাকিতে হোসেনের প্রতি দৌরাত্ম্য করে কাহার সাধ্য? সকলের মুখেই এই কথা। সকলেই রণমদে মত্ত হইয়া যুদ্ধ-সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

নিশা অবশান প্রায়, এমন সময়ে সহসা রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। অকস্মাৎ বাদ্য-ধ্বনির কারণ কেহই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অনেকে আসিয়া দেখিলেন, বহু সংখ্যক সৈন্য বীরদর্পে নগরাভিমুখে আসিতেছে। এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, হাসেন, এজিদের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মহম্মদীয়গণ ধর্ম্মযুদ্ধে চিরকালই

প্রধান, তাহাতে আবার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় হাসেন হোসেনের অবমাননা, সুতরাং, যেমনি ঘোষণা প্রচার, অমনি শত শত মদিনাবাসী ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণোৎসর্গ করিবার জন্য শত্রুর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। হাসেন তাঁহাদিগকে পরিচালিত করিবার নিমিত্ত যোদ্ধৃবেশে সংগ্রাম-ক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, পশ্চাৎদিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে মদিনার অবলাগণ কোমল করে অসিধারণ করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধের সাহায্য জন্য উত্তেজিতা হইয়া, তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন। হাসেন তদ্দর্শনে তাঁহাদিগকে নানা প্রকারে প্রবোধ দিয়া, প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। ধন্য বীর-রমণীগণ! আপনারাই স্বদেশের স্বাধীনতার গৌরব, জাতীয় ধর্ম্মের মর্য্যদা বুঝিয়াছিলেন, তজ্জন্যই মদিনার নরগণও ধর্ম্মের জন্য প্রাণোৎসর্গ করিতে শিক্ষা করিয়াছেন। বীরপ্রসবিনী না থাকিলে বীর প্রসব করিবে কে?

রমণীগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া হাসেন ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীরের বীরত্ব কে সহ্য করিবে? তিনি একাকী অসংখ্য বিপক্ষ-

সৈন্য বধ করিয়া সমরক্ষেত্রে রক্তস্রোত প্রবাহিত করিলেন। হাসেনের পক্ষের অপরাপর যোদ্ধাগণ, কে কোথায় আছেন পরস্পর জানেন না। যিনি যে স্থানে যুদ্ধ করিতেছেন, তিনি সেই স্থানে শোণিতপ্রবাহ উৎপন্ন করিতেছেন। এইরূপে এজিদ-সৈন্য প্রায় নিঃশেষ হইল। অবশিষ্ট যাহারা ছিল, তাহারা প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। মরিয়ান উপায়ান্তর না দেখিয়া সংগ্রামক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন।

মদিনাবাসিগণ শত্রুদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মদিনা আনন্দ-ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইল। এদিকে মরিয়ান মদিনাবাসিদের রণ-চাতুর্য্যের পরিচয় পাইয়া, কি করিবেন ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, একবারে হতাশ হইলেন না। পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিলেন। হাসেনকে বধ না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না, যে রূপেই হউক এজিদের আজ্ঞা সাধন করিতেই হইবে, এইরূপ স্থির করিয়া, পুনরায় সৈন্য প্রেরণের প্রার্থনা করিয়া, দমস্ক

নগরে, এজিদের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন।

মানসিক বল লোককে যত তেজস্বী ও বলবান করে, ধনবল, কি জন-বল, অপর কোন বলই মানুষকে তত শক্তিসম্পন্ন করিতে পারে না। বীজাভ্যন্তরস্থিত শক্তি যেমন প্রকাণ্ড বৃক্ষাদি উৎপন্ন করিয়া, ফল ফুলে বৃক্ষকে শোভান্বিত করে, তদ্রূপ মানসিক তেজঃ, ধর্ম্মবল, সমস্ত বাঁধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সেই তেজীয়ান পুরুষকে জনসমাজের শীর্ষ স্থানে আনয়ন করে। তাঁহার তেজ অদম্য, উপায় প্রশস্ত ও সৎ। কিন্তু ক্ষুদ্র-চেতা মরিয়ান বাহ্যিক শক্তিতে বলীয়ান সত্য, কিন্তু তাহার মানসিক বল ছিল না। তিনি সম্মুখ-সংগ্রাম-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া অবৈধ উপায়ে হাসেনকে বধ করিবার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইলেন। তদবধি ছদ্মবেশে মরিয়ান মদিনা নগরে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে জায়েদা জয়নাবকে সপত্নী জ্ঞানে অত্যন্ত বিদ্বেষ করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে হাসেন জয়নাবকে অধিকতর ভালবাসেন। এই কল্পিত ধারণার উপর দিন

দিন তাঁহার আস্থা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিসে জয়নাবকে স্বামীর ভালবাসা হইতে বঞ্চিত করিবে, এই চিন্তাই তাঁহার মস্তিষ্কে ক্রীড়া করিত। ময়মুনা নামে মদিনাবাসিনী এক দুষ্টা বৃদ্ধার সহিত ইহার উপায় নির্দ্ধারণ করিতেন। ময়মুনাও মন্ত্রবলে হউক, দ্রব্যগুণবলে হউক, জায়েদার অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া দিবে বলিয়া, তাঁহাকে আশ্বস্ত করিত। জায়েদা ভাবিতেন, সংসারে ময়মুনার ন্যায় তাঁহার আর দ্বিতীয় বান্ধব নাই। ময়মুনার নিকট জায়েদা অকপটভাবে আত্ম-মনোবেদনা প্রকাশ করিতেন। ময়মুনাও তাঁহার দুঃখ-কাহিনী শ্রবণ করিয়া, সজল নয়নে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিত। এইরূপে উভয়ের মধ্যে দিন দিন আত্মীয়তা বৃদ্ধি পাইল। ময়মুনা সর্ব্বদা জায়েদার নিকট যাতায়াত করিতে লাগিল।

মরিয়ান ছদ্মবেশে মদিনা ভ্রমণ করিয়া মনের মত লোক পাইতেছেন না। দৈবযোগে একদা ময়মুনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। অনেক কথোপকথনের পর মরিয়ান, ময়মুনার প্রকৃতি জানিতে পারিয়া, ইহাদ্বারাই হাসেনসংহার সম্ভব,

স্থির করিলেন। পরোক্ষভাবে নিজের মনের অভিপ্রায় তাহাকে জ্ঞাত করাইলেন। আশাতীত পুরস্কারের আশাও কথা প্রসঙ্গে জানাইতে ত্রুটি করিলেন না। "যে স্থানে মন্ত্রীর মন্ত্রণা ব্যর্থ, যে স্থানে বীরের বীরত্ব নিস্ফল, সে স্থানেই আমার বুদ্ধি ও কার্য্যপটুতা প্রয়োগ করি। আমাকে যৎসামান্যা স্ত্রী মনে করিবেন না।" এইরূপ আত্ম-প্রশংসা করিয়া ময়মুনা, পুরস্কারের লোভে মরি-য়ানের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে প্রতিশ্রুত হইল। "যখন যে বস্তুর অভাব হয়, অবিলম্বে পূরণ করিয়া দিব।" এই বলিয়া মরিয়ান আশা-ন্বিত হৃদয়ে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মানব প্রকৃতি যত কেন অধঃপতিত হউক না, পাপকার্য্য করিতে একটু ক্লিষ্ট না হইয়াই পারে না। ময়মুনা স্ত্রীজাতির কলঙ্ক, নরকের কীটাণু, কিন্তু, তাহার হৃদয়ও বিবেক-শূন্য নহে। যে অবধি হাসেন-বধ রূপ গর্হিত পাপ কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়াছে, তদবধি তাহার চিত্ত নানাপ্রকার বিভীষিকা দর্শন করিতেছে। কিন্তু অর্থের কি আশ্চর্য্য প্রলোভন! ময়মুনা সকল প্রকার

বিভীষিকা উপেক্ষা করিয়া, সংকল্পিত কার্য্যোদ্ধার করিবার নিমিত্ত, এমাম হাসেনের আবাসে জায়েদার নিকট গমন করিল।

সপত্নীবাদ কি ভয়ঙ্কর! এই বিষে আক্রান্ত হইলে, স্ত্রীলোকের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। স্বামী অভাবে সকলকেই সমান দুঃখ পাইতে হইবে, সকলকেই তাঁহার প্রেম হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। স্বামী, স্বপত্নী ও নিজ, উভয়ের সুখ, দুঃখের সাধারণ নিয়ন্তা, একথা আর তখন মনে থাকে না। তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াও স্বপত্নীর প্রতিশোধ লইবার প্রয়াস জন্মে। জায়েদার হৃদয়ে যদিও এই নিকৃষ্ট ভাব এপর্য্যন্ত উদিত হয় নাই, তথাপি সে সময় অতি দূরবর্ত্তী রহিল না। ময়মুনা এজিদের ঐশ্বর্য্যের কথা, দমস্করাজ্যের পাটরাণী হওয়ার সম্ভাবনা ইত্যাদি কথা প্রসঙ্গে, জায়েদার চিত্ত ক্রমশঃ প্রলোভিত করিয়া, অবশেষে হাসেন-বধের প্রস্তাব উল্লেখ করিল। শেষ বাক্যটী শুনিয়া জায়েদা শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন "স্বপত্নী-বাদ-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া, অশেষ দুর্গতি ভোগ করিব, তথাপি স্বামি-

বধরূপ মহাপাপ পঙ্কে নিমগ্ন হইব না।” স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ কোমল-হৃদয়া। সহসা মন পরিবর্ত্তিত হওয়া বিচিত্র নয়। তাহাতে ময়মুনা যাহার উপদেষ্ট্রী, সে কেমন করিয়া স্থির থাকিবে? জায়েদা, এজিদের বিভব, সুখ ও হাসেন প্রেম, তুলনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু, কিছুতেই ময়মুনার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে মন অগ্রসর হয় না। অবশেষে যেমনি জয়নাবের কথা স্মরণ হইল, তাঁহার সুখের বিষয় চিন্তা করিলেন, অমনি হাসেন-প্রেম বিস্মৃত হইলেন। “হাসেন অভাবে তাহারও যে দশা, আমারও সেই দশা।” এই বলিয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াও জয়নাবের সর্ব্বনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন; ময়মুনার প্রস্তাবে স্বীকৃতা হইয়া স্বামীর প্রাণ সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। ময়মুনা জায়েদার সম্মতিতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল। পূর্ব্ব হইতেই তীক্ষ্ণ বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। কি প্রকারে ব্যবহার করিতে হইবে, সমস্ত উপদেশ দিয়া, ময়মুনা জায়েদার হস্তে বিষের কৌটা প্রদান করিয়া বলিল “সাবধান, কার্য্য গোপনে সাধন করিও।

সুযোগ মত ব্যবহার করিলে মনোস্কামনা পূর্ণ হইবে, জয়নাবের সর্ব্বনাশ হইবে।”

ইতিমধ্যে হাসেন প্রয়োজন বশতঃ প্রায় আট দিন জায়েদার ভবনে আগমন করেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন না জানি জাঁয়েদা আজ তাঁহাকে দেখিয়া কতই অভিমান করিবেন। কিন্তু, কার্য্যে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিলেন। আজ জায়েদা পূর্ব্বাপেক্ষা শত গুণে সরল। এই আশাতীত সরলতা সন্দর্শন করিয়া হাসেন সেই রজনী জায়েদার গৃহে অবস্থান করিতে সংকল্প করিলেন। জায়েদা স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির সুযোগ পাইলেন। তিনি এক হস্তে বিষমিশ্রিত মধুপাত্র, এবং অপর হস্তে স্নিগ্ধ জলপাত্র ধারণ করিয়া, স্বামিসমীপে দণ্ডায়মান হইয়া, কপট প্রেমভরে বলিলেন “অদ্য আট দিন যাবৎ এই মধু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি। ইহা অতি উপাদেয়, আপনি একবার সেবন করিয়া দেখুন।” নারী প্রকৃতির প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করা সহজ নয়। সরল প্রেমিক হাসেন, মায়াবিনীর বাক্য-জালে আবদ্ধ হইয়া, প্রফুল্লচিত্তে মধুপান করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে হাসে-

নের শরীরে বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইল। শরীরের কান্তির পরিবর্ত্তন ও পিপাসাধিক্য জন্মিল। ক্রমে দৃষ্টিশক্তি হীন ও শরীর অবশ হইল। হাসেন জায়েদাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "প্রিয়ে, এ কেমন মধু, যন্ত্রণায় প্রাণ যে যায়?"

জায়েদা তাঁহাকে তালবৃন্তদ্বারা স্বহস্তে ব্যজন করিতেছেন, মস্তকে শীতল বারি সিঞ্চন করিতেছেন, কিন্তু, কিছুতেই তাঁহার জ্বালার বিরাম নাই। জায়েদার চেষ্টা সফল হইল ভাবিয়া, তিনি অন্তরে অন্তরে আশান্বিত হইলেন। কিন্তু, প্রকাশ্যে সে প্রফুল্লভাব গোপন করিয়া কপটভাবে বলিলেন "আমার অদৃষ্ট মন্দ, দেখি, আমিও একটু পান করিয়া দেখি।" কিন্তু হাসেন তাঁহাকে সেবন করিতে দিলেন না। তাঁহাকে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে বলিলেন। হাসেনও স্বয়ং উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া, জায়েদার গৃহেই সেই রাত্রি অবস্থান করিলেন। কেহকে তত্ত্ব বার্ত্তা দিলেন না। নাম সাধনের কি অলৌকিক ক্ষমতা! সেই যন্ত্রণাহারী ভগবানের নাম করিতে করিতে

হাসেন ক্রমে ভাল বোধ করিতে লাগিলেন। রাত্রি অতিবাহিত হইল, প্রাত্যহিক রীত্যনুসারে মাতামহের সমাধি মন্দিরে গিয়া বিনীত ভাবে প্রার্থনাকার্য্য সমাধা করিলেন। ক্রমে তাঁহার শরীর সুস্থ হইল, কিন্তু বিষের দোষ একবারে নিরাকৃত হইল না।

জায়েদার চেষ্টা নিষ্ফল হইল। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ প্রেমময়ী, কিন্তু একবার শত্রুতা সাধনে উত্তেজিত হইলে, তাহা শেষ না করিয়া কখনই ক্ষান্ত হন না। জায়েদাও ভগ্নোদ্যম হইলেন না, যেরূপে হউক স্বামীর প্রাণ-সংহারে কৃত সংকল্প হইয়া, ময়মুনাকে বলিলেন "এইবার বাজার হইতে আমাকে কতকগুলি খর্জ্জুর ফল আনিয়া দাও; তন্মধ্যে কালকূট পূরিয়া এবার এমন ভাবে উহা ব্যবহার করিব যেন কোন রূপেই সন্ধান ব্যর্থ না হয়।

জায়েদার আদেশানুযায়ী পরিপক্ক খর্জ্জুর ফল ময়মুনা অতি গোপনে, বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়া দিল। জায়েদা সেই খর্জ্জুর সমূহের কতকগুলিতে এমন ভাবে চিহ্ন দিলেন যে উহা

অন্য কাহারও চক্ষে পড়িবার সম্ভাবনা রহিল না। কৌটা হইতে প্রাণান্তক বিষ বাহির করিয়া, অবশিষ্ট গুলিতে উহা পূরিয়া রাখিলেন। তৎপর সমস্ত খেজুর একত্রে মিশ্রিত করিলেন।

পূর্ব্ব দিন হাসেন জায়েদার গৃহে মুহূর্ত্ত কালের জন্যও সুস্থির ছিলেন না। যন্ত্রণায় সর্ব্বদা ছট্ ফট্ করিয়াছিলেন। জায়েদার সহিত একটি বাক্যা-লাপও হয় নাই। এই নিমিত্ত অদ্য রজনীও তাঁহার ভবনে অবস্থান করিবার ইচ্ছা জয়নাবকে জ্ঞাপন করিলেন। তিনি জানিতেন যে সপত্নীর মনে কষ্ট দেওয়া পাপ। স্বামি-ধনে কেহকেই বঞ্চিত করা উচিত নয়। সুতরাং, জয়নাব সানন্দে হাসেনকে বিদায় দিলেন। হাসেন জয়নাবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, জায়েদার ভবনে গমন করিলেন। জায়েদা তাঁহার কৌশল-জাল পূর্ব্ব হইতেই বিস্তার করিয়া বসিয়া আছেন। গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি অতি আনন্দের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। সরল প্রেমে কখনও কখনও মান অভি-মান ঘৃণা তাচ্ছল্য দেখা যায়। কিন্তু, কপট প্রেমে বাহ্যিক বিরক্তিভাবের সম্পূর্ণ অভাব। হাসেন

জায়েদার আদরে কোনরূপ সন্দিগ্ধ হইলেন না, পরম আহ্লাদিত হইয়া, তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। হাসেন শৈশব কাল হইতেই খেজুর ভাল বাসিতেন। সুযোগ বুঝিয়া জায়েদা, খেজুর খাইবার নিমিত্ত, তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। গত রজনীতে মধু পান করিয়া অবধি, হাসেন একটু সন্দিহান হইয়াছেন। তিনি ইতস্ততঃ করিতেছেন, ইত্যবসরে চতুরা জায়েদা চিহ্নিত খর্জ্জুর স্বামীর পূর্ব্বেই ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে হাসেনও অসন্দিগ্ধচিত্তে খর্জ্জুর ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। গুটিকতক ভক্ষণ করিলে, বিষের কার্য্য আরম্ভ হইল। হাসেন সন্দেহ প্রযুক্ত আর খাইলেন না। কিন্তু উহাতেই শরীর বিষ-জ্বালায় দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। কোন বাক্যালাপ না করিয়া,তিনি অবিলম্বে প্রিয় ভ্রাতা হোসেনের গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। সেখানে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিলেন; নিদারুণ বিষের যন্ত্রণা ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিল। কিন্তু, মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় এ যাত্রাও পূর্ব্ববৎ ঈশ্বরের নাম জপ করিতে করিতে হাসেন আরোগ্য লাভ

করিলেন। এবারে জায়েদার অভিসন্ধি হাসেন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু, কেহকে কিছু বলিলেন না। বাহিরের চিরশত্রুর হস্ত হইতেও, সতর্কতা অবলম্বন করিলে, অনেক সময়ে, আত্ম-রক্ষা সম্ভব; কিন্তু, মিত্র যদি শত্রু হয়, বিশ্বাসী যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে তাহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। যে জায়েদা হাসে-নের প্রাণাধিক প্রিয় ছিলেন, যিনি সর্ব্বদা হাসে-নের জন্য মহাব্যস্ত থাকিতেন, যিনি সুখে দুঃখে হাসেনের সমভাগিনী, সেই অর্দ্ধাঙ্গিনী আজ স্বামী বিনাশের নিমিত্ত, অসঙ্কোচিতচিত্তে স্ব হস্তে বিষ প্রদান করিলেন। এইরূপ শত্রু-সঙ্কুল-ভবনে অব-স্থিতি বিপদ জনক মনে করিয়া, হাসেন স্বীয় পুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক কতিপয় মিত্র সমভিব্যাহারে মদিনার নিকটস্থ মুসলনগরে গমন করিলেন। মুসলবাসিগণ তাঁহার আগমনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে ভক্তি সহকারে অভ্যর্থনা করিলেন।

এখানেও তিনি অধিক দিন বিশ্রাম করিতে পারিলেন না। বিপদ এখন তাঁহার পদে পদে অনুসরণ করিতে লাগিল। দমস্কনগরবাসী

জনৈক এক-চক্ষু বৃদ্ধ হজরত মহম্মদের পরম শত্রু ছিল। মহম্মদের বংশের যাঁহাকে সুযোগমতে পাইবে, তাঁহারই প্রাণ সংহার করা তাহার সংকল্প ছিল। হাসেন মদিনাত্যাগ করিয়া মুসল নগরে অবস্থান করিতেছেন, এই সংবাদ দমস্ক নগরে প্রচারিত হইবামাত্র, ঐ বৃদ্ধ বিষ-সংযুক্ত এক সুতীক্ষ্ন বর্ষা হস্তে করিয়া শত্রুর প্রাণ-সংহার উদ্দেশ্যে মুসলনগর যাত্রা করিল। অবিশ্রান্ত পথ চলিয়া, যথাসময়ে তথায় উপনীত হইল। হাসেন ঐ নগরের উপাসনা মন্দিরে বাস করিতেন। ধূর্ত্ত বৃদ্ধ বিষাক্ত বর্ষা লুক্কায়িত রাখিয়া হাসেনের সমীপে উপস্থিত হইল। "সয়তানের কুহকে পড়িয়া এতকাল মহম্মদীয় ধর্ম্ম তুচ্ছ করিয়াছি, এইক্ষণ ঈশ্বরের কৃপায় সত্য ধর্ম্মের জ্যোতিতে আমার ভ্রমান্ধকার বিদূরিত হইয়াছে। বিধর্ম্মীকে সত্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করা মহাপুণ্য-কর্ম্ম। অতএব আমাকে পবিত্র সনাতন ধর্ম্মে দীক্ষিত করুণ" এই বলিয়া বৃদ্ধ, হাসেনের পাদদেশে লুটিয়া পড়িল। হাসেন ঈদৃশ অনুতাপের ভাব দর্শন করিয়া দয়ার্দ্র চিত্তে তাহাকে মুসলমান-ধর্ম্মে

দীক্ষিত করিলেন। বৃদ্ধ সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুসলম্মান-ধর্ম্ম গ্রহণ করায়, হাসেনের বিশেষ প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিল।

বৃদ্ধ কার্য্যান্তরে গমন করিলে পর, আব্বাস নামক হাসেনের সঙ্গীয় এক ব্যক্তি আগন্তুক বৃদ্ধের কার্য্যদর্শনে সন্দিহান হইয়া হাসেনকে সতর্ক করিয়া বলিলেন "এই ব্যক্তি কোন স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশ্যে, সুযোগের প্রতীক্ষায় এইরূপ শরণাগত হইয়াছে।" সরলমনা হাসেন সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। বিষয়ান্তরের আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কথোপকথন করিতে-ছেন, এদিকে বৃদ্ধ লুক্কায়িত থাকিয়া হাসেনের প্রাণ-সংহারের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছে। আব্বাস সর্ব্বদাই সচকিতনয়নে এদিক ওদিক দৃষ্টি করিতেছেন। সে বড় চতুর, নিকটে গেলে কোন রূপে নিষ্কৃতি নাই, বিবেচনা করিয়া, দূর হইতেই পৃষ্ঠ-দেশ লক্ষ করিয়া বর্ষা নিক্ষেপ করিল। বর্ষা লক্ষভ্রষ্ট হইয়া হাসেনের পাদতল বিদ্ধ করিল। বর্ষার আঘাতে তিনি ভূতলে পড়িয়া গেলেন। আব্বাস সে দিকে দৃষ্টিপাত না

করিয়া অতিত্রস্তে যাইয়া বৃদ্ধকে ধৃত করিলেন। আব্বাস তাহাকে ধরিয়া আনিয়া, বর্শাদ্বারা তাহার বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিতে উদ্যত, এমন সময় ক্ষমা-বতার হাসেন অনুনয় করিয়া বলিলেন “ভাই, যাহা হইবার হইয়াছে, ক্ষমা কর, বিচারের ভার স্ব হস্তে লইও না। সর্ব্ব-বিচারকের প্রতি বিশ্বাস করিয়া, তাঁহার প্রতিই বিচারের ভার অর্পণ কর। বৃদ্ধকে মুক্তি দাও, এই আমার প্রার্থনা।” ধন্য হাসেন, ধন্য তোমার ক্ষমাশীলতা!

আব্বাস বৃদ্ধকে ছাড়িয়া দিলেন। হাসেন বর্শার আঘাতে, বিষের যন্ত্রণায়, ক্রমে ক্রমে অব-সন্ন হইয়া পড়িলেন। মাতামহের সমাধি-মন্দির ত্যাগ করিয়া ভাল কাজ করি নাই, এই বলিয়া পুনরায় তথায় যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সঙ্গীয় মিত্রগণ শীঘ্র শীঘ্র তাঁহাকে মদিনায় লইয়া আসিলেন। তাঁহার শরীর ক্রমে ক্রমে অবশ হইতে চলিল, স্বর ক্ষীণ হইল; সেই ক্ষীণ কণ্ঠে পবিত্র সমাধি-মন্দিরে মঙ্গলময় জগদীশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে বিষের যন্ত্রণা কিঞ্চিৎ লাঘব হইল, কিন্তু, ক্ষত দিন দিন বৃদ্ধি

হইতে লাগিল। তৎসঙ্গে সঙ্গে পুনরায় জ্বালা যন্ত্রণাও বৃদ্ধি পাইল। হাসেনের চলৎশক্তি রহিত হইল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া ভ্রাতৃবৎসল হোসেন অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। সুচিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার নিমিত্ত, তাঁহাকে স্বীয় বাসভবনে লইয়া গেলেন।

হাসেন জায়েদার অভিসন্ধি বিশেষরূপ জানিতে পারিয়াছিলেন। এখন তিনি অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীলোক মাত্রকেই সন্দেহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, জায়েদাকে দেখিলে এখন ভয়ে তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিত। প্রধানা মহিষী হাসনেবানুর পরিচর্য্যায় তিনি প্রীত হইয়া তাঁহাকে মনের ভাব আভাসে জানাইয়া বলিলেন "আমার আহারীয় ও পানীয় দ্রব্য সাবধানে রাখিও"। হাসনেবানু তদবধি অত্যন্ত সতর্ক হইয়া আহারীয় সামগ্রী বিশেষ যত্নে রাখিতেন। উত্তমরূপ পরীক্ষা না করিয়া স্বামীকে কিছু আহার করিতে দিতেন না। জল যে পাত্রে থাকিত তাহার মুখ পরিষ্কার বস্ত্রে আবৃত করিয়া, মোহরদ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করিয়া রাখিতেন।

জায়েদা সময়ে সময়ে স্বামীকে দেখিতে আসেন। একদা তাঁহার সহিত ময়মুনাও হাসেনকে দেখিতে আসিল। কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া উভয়ে জায়েদার গৃহে ফিরিয়া গেলেন। "ঈশ্বর যাহাকে রক্ষা করেন, কিছুতেই তাহার বিনাশ নাই। নতুবা বিষ-পান করিয়া মানুষ কেমন করিয়া জীবিত থাকে ?" জায়েদা হতাশ চিত্তে এইরূপ বলিলেন। ময়মুনা তাঁহাকে আবার উৎসাহিত করিল। "চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই। একবার, দুইবার, তিনবার যতবারে হয় কার্য্য উদ্ধার করাই শ্রেয়ঃ। হতাশ হইও না।" এই কথা বলিয়া ময়মুনা কটিদেশ হইতে ক্ষুদ্র এক পুটুলী বাহির করিয়া জায়েদার হস্তে প্রদান করিল ; এবং বলিল "এ বিষ অতি তীক্ষ্ণ, কোন রূপে এক বিন্দু পেটে পড়িলে আর রক্ষা নাই।" জায়েদা বলিলেন "হাসেন আর আমার গৃহে আসিবেন না। হাসনেবানু প্রভৃতি যেরূপ সতর্ক, তাহাতে এই বিষ ব্যবহারের সুযোগই বা কিরূপে করিব ?" অসতের অসৎবুদ্ধির ইয়ত্তা নাই। ময়মুনা ইহারও উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া

বলিল "তোমার সে ঘরে যাইতে নিষেধ নাই, সর্ব্বদা সেখানে যাতায়াত করিও, সুযোগ মতে জলপাত্রাচ্ছাদিত বস্ত্রাবরণের উপর বিষ ঘর্ষণ করিও, যেমন জল তেমনি থাকিবে; বস্ত্রের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া বিষ-কণিকা জলে পড়িয়া মিশিয়া যাইবে। সেই জল পান করিলে, হাসেনের আর নিস্তার থাকিবে না।"

এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া জায়েদা সে দিন ঘন ঘন হাসেনের কক্ষে আসা যাওয়া করিলেন। দিবা ভাগে কোন সুযোগ পাইলেন না। হাসনেবানু স্বামীর শয্যাপার্শ্বে বিষণ্ণ বদনে বসিয়া সর্ব্বদা স্বামীর পরিচর্য্যা করিতেন। তাঁহার পীড়া হওয়া অবধি, তিনি নিয়মিত রূপে ঈশ্বর উপাসনাদিও করিতে পারিতেন না। জয়নাব হাসনেবানুর উপদেশ মত স্বামীর জন্য দিন রাত্রি খাটিতেন। বিনা প্রয়োজনে তিলার্দ্ধ কালও স্বামীর পদছাড়া হইতেন না। অদ্য হাসনেবানু নিশীথ সময়ে ভগবানের অর্চ্চনার জন্য ভজনালয়ে চলিলেন। গৃহস্থিত অন্যান্য সকলে নিদ্রিত। স্বামি-পদ বক্ষে ধারণ করিয়া জয়নাব তাঁহার সেবা করিতে

করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন। জায়েদা যে সুযোগের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, সেই সুবিধার সময় উপস্থিত হইল। তিনি অতি ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া জলপাত্রের মুখাবৃত বস্ত্রের উপর বিষচূর্ণ ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। অতি সহজেই সেই চূর্ণগুলি জলে পতিত হইল। ভয়-বিহ্বল-চিত্তে জায়েদা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নিজ কক্ষে প্রস্থান করিলেন।

জায়েদা ব্যস্ত হইয়া বাহির হইবার সময়, দ্বারে আঘাত লাগিয়া একটু শব্দ হইল। সেই শব্দে হাসেনের নিদ্রা ভঙ্গ হইল; কিন্তু, চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন প্রদীপ পূর্ব্ববৎ জ্বলিতেছে, যেখানে যাহা ছিল সমস্তই ঠিক আছে। ঐ শব্দের প্রকৃত কারণ কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। জাগ্রত হইয়া হাসেন অত্যন্ত তৃষ্ণাবোধ করিলেন। জয়নাবের নিকট জল চাহিলেন। জয়নাব "অজু" করিবার জল আনিতে বাহিরে গিয়াছেন। এমন সময়ে হাসনেবানু গৃহে প্রবেশ করিয়া স্বামীকে জাগ্রত দেখিয়া, তাঁহার শারীরিক অবস্থা কিরূপ, জিজ্ঞাসা করি-

লেন।• ইত্যবসরে হাসেন বলিলেন, "এইমাত্র স্বপ্নে দেখিলাম যেন পিতা, মাতা, মাতামহ আমার অপেক্ষায় স্বর্গদ্বারে দণ্ডায়মান আছেন।" এই কথা বলিয়া তাঁহার নিকটও জল চাহিলেন। স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হাসনেবানু অত্যন্ত অস্থির হইলেন। তাঁহার বুদ্ধিশক্তি লোপ হইল; মস্তক ঘুরিতে লাগিল। পাত্র হইতে জল আনিয়া পরীক্ষা না করিয়াই স্বামীর হস্তে প্রদান করিলেন। হাসেন জলপান করিবামাত্র, বিষে তাহার সর্ব্ব শরীর আচ্ছন্ন হইল। সমস্ত শরীর বিষের জ্বালায় দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। পরিজনবর্গ সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। হোসেন ভ্রাতার ঈদৃশ যন্ত্রণা দেখিয়া শোকে দুঃখে বিহ্বল হইয়া পাত্রাবশিষ্ট জলপান করিতে উদ্যত হইলেন। হাসেন সেই মুমূর্ষু অবস্থায়ও ভ্রাতার হস্ত হইতে ভাণ্ড গ্রহণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন, উহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। হোসেন অতি রোষভরে বলিলেন, "আমার পরমারাধ্য ভ্রাতার প্রাণ বিষদানে যে নষ্ট করিয়াছে, আমি তাঁহার প্রতিশোধ লইব।" তৎপর হাসেনকে সম্বোধন করিয়া

বলিলেন, "ভাই, বল কে তোমার প্রাণ নাশ করিল। আমার হৃদয় কি এতই কঠোর, আমি কি এতই ভ্রাতৃ-প্রেম বিবর্জ্জিত যে ধমনীতে রক্ত-প্রবাহ থাকিতে ভ্রাতৃ-হত্যার প্রতিশোধ লইবনা? ভাই, ত্বরায় সেই পাপাত্মার নাম বল।"

হাসেন পূর্ব্বাবধি বিষ-কাণ্ড গোপন করিয়া আসিতেছিলেন। জায়েদা কেন যে তাঁহার সহিত এরূপ ব্যবহার করিলেন, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে-ছেন না; তথাপি তাঁহার প্রেমের ব্যত্যয় নাই। তাঁহার প্রতি হাসেন ক্রোধ, হিংসা, কি দ্বেষ কি-ছুই করিলেন না। বরং তাঁহার আত্মার সদ্গতির জন্য ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিলেন। ভ্রাতাকে বলিলেন "ভাই, আমি আমার বিষদাতাকে চিনি; ঈশ্বর তাঁহার বিচার করিবেন। আমি তাঁহার নাম প্রকাশ করিব না। কিন্তু তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বল, সময়ে তাঁহার নাম প্রকাশ হইলেও, তুমি তাঁহার প্রতি কোনরূপ দণ্ডবিধান করিবেনা। আমার শরীর অবসন্ন বোধ হইতেছে, মৃত্যু নিকট, পুত্র কাসেমকে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম। বড় সাধ ছিল তোমার কন্যা সখিনার সহিত

ইহার বিবাহ দেই। কিন্তু, সে মনোস্কামনা পূর্ণ হইল না। অনুরোধ করি ইহার উদ্বাহ ক্রিয়া যেন তাহার সহিতই সম্পন্ন হয়।”

মুমূর্ষু হাসেন যন্ত্রণায় অস্থির; তিনি হোসেনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “ভাই, তোমরা সকলে একবার বাহিরে যাও, নির্জ্জনে জায়েদার সহিত আমার একটি কথা আছে।” সকলে বাহিরে চলিয়া গেলেন। হাসেন প্রেম-ভরে, ধীরে ধীরে জায়েদাকে বলিলেন “জায়েদা, তোমাকে বড় বিশ্বাস করিতাম, বড় ভাল বাসিতাম, তাহার ফল তুমি হাতে হাতে দিলে, ইহাতে আমি দুঃখিত নই। আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম; প্রার্থনা করি তুমি সুখে থাক।” প্রেমিকের হৃদয় কি মহান! হাসেন, তুমিই প্রকৃত প্রেমিক!

পতিবাক্য শ্রবণ করিয়া জায়েদা অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। সকলে পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিলেন। হাসেন একে একে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বশেষে ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “এস ভাই; জন্মের মত তোমার সহিত প্রেমালিঙ্গন করি।” এই বলিয়া অনুজের

গলা ধরিয়া অবিরল ক্রন্দন করিতে করিতে বলি-লেন "ভাই, সময় হইয়াছে, এখন বিদায় দাও।" অনন্তর একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে হাসেন অমর ধামে চলিয়া গেলেন।

হাসেনের বিয়োগে পরিজনবর্গ শোক-বিহ্বল হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। মদিনাবাসী সকলেই শোকার্ত্ত হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে লাগি-লেন। মদিনানগর, হাসেন-সূর্য্য অস্তমিত হওয়ায়, একবারে তমসাচ্ছন্ন হইল। মদিনাবাসিগণ "হায় হাসেন!" "হায় হাসেন!!" "হায় হাসেন!!!" ইত্যাকার রব করিয়া করাঘাতে বক্ষস্থল স্ফীত করিয়া ফেলিল। এই বিষাদময় দৃশ্য অনুকরণ করিয়া অদ্য পর্য্যন্ত মুসলমানগণ মহরম-পর্ব্বের সময়ে "ছাতি পিটিয়া" থাকেন।

হাসেনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে নানা জনরব প্রচারিত হইতে লাগিল। তাঁহার মৃত্যু যে অস্বাভাবিক, সে সম্বন্ধে কেহরও কোন সন্দেহ রহিল না। জায়েদা কোন্ প্রাণে বিষ-প্রয়োগ করিয়া প্রিয়তম স্বামীর প্রাণ বিনাশ করিল? এরূপ পাপিনীর স্থান কোথায় হইবে?

পাপাত্মার নরকও এরূপ পাপিয়সীর উপস্থিতিতে কলঙ্কিত হইবে। জনসাধারণ এইরূপ আলোচনা করিতে লাগিল। জায়েদা লজ্জার দায়ে কিয়দ্দিন হাসেনের আশ্রমেই ছিলেন। কিন্তু, এজিদের পুরস্কার, সম্রাজ্ঞী হওয়া ইত্যাদি বিষয়ই সেই সময় তাঁহার চিন্তার বিষয় ছিল। ক্রমে ক্রমে জনরব দ্রুত গতিতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিল। পাপ কার্য্য কখনই গোপন থাকে না। জায়েদা অতি সাবধানে ও সংগোপনে যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানিতে পারিল। জায়েদা হাসেন-পুরী পরিত্যাগ করিতে পূর্ব্বাবধিই উৎসুক, এই স্থানে থাকা এখন নিরাপদও নহে; সুতরাং ময়মুনার সহিত পরামর্শ করিয়া রাত্রিযোগে দমস্ক যাত্রা করিলেন।

সময়ের কি অলৌকিক শক্তি! এক সময়ে যে শোক লোককে উন্মত্ত করিতেছে, শত শত উপদেশ ও সান্ত্বনাবাক্যদ্বারা যে শোকাগ্নি প্রজ্জ্বলিত ভিন্ন প্রশমিত হইতেছে না, সময়-স্রোতে সেই শোকাগ্নি আপনিই নির্ব্বাপিত হইতেছে, হোসেনের ভ্রাতৃ-শোক কিঞ্চিৎ অপনোদিত

হইল ; তিনি পরিজনবর্গকে সান্ত্বনা বাক্যে প্রকৃতিস্থ করিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতে লাগিলেন। হাসেন-বধ-জনরব তাঁহার কর্ণেও প্রবিষ্ট হইল। হোসেন ভ্রাতার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে বিষদাতার অনুসন্ধান পাইলেও তাহার শাস্তি বিধান করিবেন না ; সুতরাং জায়েদার অনুসন্ধান আর করিলেন না। স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন।

জায়েদা ও ময়মুনা যথাসময়ে দমস্কনগরে উপস্থিত হইলেন। চির-শত্রু হাসেনের বধ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া এজিদ মহানন্দে উন্মত্ত হইয়া অনবরত সুরাপান করিতেছেন। কিন্তু, মানবীয় মনের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! হঠাৎ এজিদের মনে অনুতাপাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনাবলী স্মরণ করিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন। চিরশত্রু বিনাশের প্রধান সাহায্যকারিণীদের সহিতও সে দিন সাক্ষাৎ করিলেন না। পরদিন সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া, অদ্য বিশেষ মর্য্যদার সহিত তাঁহাদিগের তত্ত্বাবধান করিতে আদেশ করিলেন।

যেমন ঘোর কাল মেঘাভ্যন্তরে বিদ্যুৎ ক্ষণদৃষ্ট হইয়াই বিলুপ্ত হয়, তদ্রূপ এজিদের অন্তরে অনুতাপাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া পর মুহূর্ত্তেই নির্ব্বাপিত হইল। আবার সুরা-স্রোতে শরীর মন ভাসাইয়া দিলেন। পুনরায় এজিদ স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। নিশাকে আশ্রয় করিয়া নিদ্রাদেবী ক্রমে ক্রমে তাঁহার অধিকার স্থাপন করিলেন।

এজিদ পরদিন প্রভাতে, গাত্রোত্থান করিয়া জায়েদা ও ময়মুনাকে ডাকাইলেন। রাজ-দরবারে যথোচিত মর্য্যদা সহ তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া, নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করিবার জন্য প্রতিশ্রুত অর্থ দিবার আদেশ করিলেন। ধন-ভাণ্ডার হইতে অর্থ আনিয়া দেওয়া হইল। পাপ যে কি ঘৃণিত বস্তু বাক্যে তাহা প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। যে এজিদ হাসেন-বধের জন্য সর্ব্বস্বপণ করিয়া বসিয়াছিলেন, যাঁহার চির-শত্রু-হন্ত্রী তাঁহার নিকট পূজার্হা হইবে বলিয়া মনে হইত, সেই পাপাত্মা এজিদও জায়েদা ও ময়মুনার ঘৃণিত, পাপ কার্য্য সমর্থন করিতে পারিলেন না।

তাঁহারা কলুষিত হৃদয়ও বিশ্বাসঘাতিনী স্বামি-বধ-কারিণীর কার্য্যে রোষাগ্নিতে পরিপূর্ণ হইল। তিনি স্বহস্তে সভা-মধ্যে পাপিয়সী জায়েদাকে দ্বিখণ্ডিত করিলেন, এবং ময়মুনাকেও প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন। তাহারা পাপের ফল হাতে হাতে পাইয়া কর্ম্মানুযায়ী পুরস্কার পাইল।

হাসেনের প্রাণ-সংহার হইল, এজিদের প্রধান শত্রুর পতন হইল। কিন্তু, তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না। যাহার জন্য সর্ব্বস্বপণ, পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন, সেই জয়নাব-রত্ন লাভ হইল না। হোসেন বর্ত্তমান থাকিতে সে বাঞ্ছা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা-ইবা কি? সুতরাং এজিদ নূতন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। হোসেন-বিনাশ এখন তাহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল।

মরিয়ান ছদ্মবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মদিনার সমীপবর্ত্তী স্থানে শিবির-সন্নিবেশ করিয়া এজি-দের আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শীঘ্র কোন আদেশ না পাইয়া, তিনি উদ্বিগ্ন মনে স্বয়ংই দমস্কনগরে গমন করিয়া এজিদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এজিদ হাসেন-বধের জন্য তাঁহাকে

বিশেষ প্রশংসা করিয়া হোসেন-বধ-কার্য্যে ব্রতী হইতে আদেশ করিলেন। "হোসেন, কাসেম প্রভৃতি বিখ্যাত বীর। কিন্তু, ভ্রাতৃশোক ও পিতৃ-বিয়োগ জনিত যন্ত্রণা তাঁহাদিগকে এক প্রকার অকর্ম্মণ্য করিয়াছে। এই শোক অপনোদিত হইলে সেই পুরুষ সিংহদ্বয় অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। সুতরাং যত শীঘ্র হয় হোসেন বধ করিবার উদ্যোগ কর, বিলম্ব করিও না।" এই বলিয়া মরিয়ানকে পুনরায় মদিনায় প্রেরণ করিলেন।

হোসেন ভ্রাতৃ-বিয়োগের পর হইতে দিবা রাত্রি মাতামহের সমাধি-মন্দিরে অবস্থান করিতে-ছিলেন। পবিত্র স্থানের জ্যোতিঃ উজ্জ্বল ও পাপীর ভয়প্রদ। মরিয়ান সে স্থানের তেজে ভীত হইয়া হোসেনকে তথায় আক্রমণ করিতে সাহস করিলেন না। কৌশলক্রমে হোসেনকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। আবার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, মরি-য়ান এক দিবস রজনীতে সেই পবিত্র সমাধি-মন্দিরের সমীপবর্ত্তী হইয়া বন্ধুভাবে হোসেনকে

বলিলেন "এজিদ কি পাপিষ্ঠ! আপনাকে এই পবিত্র স্থানে আক্রমণ করিবার জন্য অসংখ্য সৈন্য প্রেরণ করিয়াছে। অদ্য রজনীতেই তাহারা আপনাকে আক্রমণ করিবে। অতএব আপনি স্থানান্তরিত হইয়া, আত্ম-রক্ষার চেষ্টা করুন। আমরা এজিদের বেতনভোগী ভৃত্য, কিন্তু অন্তরে অন্তরে আপনারই দাস। আর অধিক বিলম্ব করিতে পারিতেছি না।" এই বলিয়া মরিয়ান প্রস্থান করিলেন।

হোসেন তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় করিয়া এই সংবাদ মনে মনে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। মদিনাবাসিগণ প্রাণান্তেও আমার প্রতি অত্যাচার সহ্য করিবে না। নরনারী সকলেই মহম্মদের পরিজনের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে প্রস্তুত। তবে ভয়ে স্থানান্তরিত হইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু, এখানে অবস্থান করিলে সমস্ত মদিনাবাসী আমাদের জন্য লাঞ্ছনা ভোগ করিবে। এইরূপ আলোচনা করিয়া বন্ধুবর জেয়াদের রাজ্য কুফা নগরে কতিপয় দিবস বাস করিবার সংকল্প করিলেন। আত্মীয়

স্বজনের সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করিলেন; কিন্তু, কেহই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। অথচ হোসেন তথায় যাইবার কামনা ত্যাগ করিলেন না। বিনা আহ্বানে যাওয়া ভাল নয়, বিবেচনা করিয়া তিনি সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

অর্থের লোভে মানুষ প্রণয় পবিত্রতা, বন্ধুত্ব সকলই বিসর্জ্জন করিতে পারে। ভাবিয়া দেখিলে একদিকে অর্থ না হইলেই নয়; পক্ষান্তরে লোভীর নিকট উহা অনর্থের মূল। জেয়াদা হোসেনের বন্ধু, অকৃত্রিম প্রণয়-সূত্রে উভয়ে আজন্ম আবদ্ধ। কিন্তু, যে মুহূর্ত্তে মরিয়ানের পরামর্শে দমস্কনগর হইতে তিন লক্ষ মুদ্রা তাঁহার সম্মুখে স্থাপিত হইল, সেই মুহূর্ত্তেই জেয়াদা বিচলিত হইলেন। হোসেন কে? তাঁহার সহিত প্রণয়ে লাভ কি? মুখের ভালবাসায় কোনরূপ অর্থাগম হয় না। অতএব তাঁহার অনিষ্টে আমার ক্ষতি কি? এইরূপ ইতস্ততঃ করিতে করিতে অর্থের জন্য সমস্ত আত্মীয়তা ভুলিয়া গেলেন। মরিয়ানের ষড়যন্ত্রে যোগদান করিতে সম্মত হইলেন।

পরদিন প্রাতে স্বীয় রাজ্যে ঘোষণা করিলেন যে ভ্রাতৃশোকে হোসেন অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন। এজিদ নানাপ্রকারে তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতেছেন, ধর্ম্মানুসারে তাঁহার সাহায্য করা আমাদের কর্ত্তব্য। অতএব আমি সংকল্প করিয়াছি যে হোসেন স্বয়ং আমার সিংহাসনে আসীন হইয়া আমার সমস্ত বিভবাদি ভোগ করুন। আমি অদ্য হইতে সিংহাসন পরিত্যাগ করিলাম। যে পর্য্যন্ত তিনি আসিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ না করেন, সেই পর্য্যন্ত উজীরের নামে শাসন সংরক্ষণ হইবে। এই মর্ম্ম সম্বলিত পত্র সহ হোসেনকে আনয়নার্থ দূত প্রেরণ করিতে আদেশ করিলেন। কুফাবাসী মুসলমানগণ অত্যন্ত প্রীত হইলেন; সকলেই উৎসুক চিত্তে হোসেনের শুভাগমন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

দূত যথাসময়ে মদিনায় উপস্থিত হইয়া হোসেনের হস্তে পত্র অর্পণ করিলেন। হোসেন যে আহ্বানের অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই সুবিধা পাইয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং সত্বরই তথায় গমন করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু, কেহ

কেহ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। দমস্ক নগর হইতে জেয়াদাকে যে উৎকোচ স্বরূপ অর্থ প্রেরিত হইয়াছিল, সেই সংবাদও তাঁহাকে জানান হইল; কিন্তু, সরলচিত্ত হোসেন বন্ধুর প্রতি কোন সন্দেহ করিতে পারিলেন না। তিনি সকলের কথা অবহেলা করিয়া তথায় যাওয়াই স্থির করিলেন। ইতিমধ্যে একজন অমাত্য বলিলেন যে একান্ত যাওয়া কর্ত্তব্য হইলে, প্রথমতঃ একজন বিচক্ষণ লোক প্রেরণ করিয়া, জেয়াদের সহসা এরূপ ভাবে রাজ্য-ত্যাগের প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করা উচিত। এই প্রস্তাবানুসারে মোসলেম নামক একজন বিশ্বাসী ও বিচক্ষণ লোক তথায় সর্ব্বাগ্রে প্রেরণ করিলেন।

মোসলেম উপযুক্ত সময়ে কুফা নগরে পৌঁছিলেন। জেয়াদ তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া, হোসেনের প্রতিনিধি স্বরূপ সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট হইতে অনুরোধ করিলেন। লোক কপটতার আশ্রয়ে যত সরলতা, এবং প্রণয় প্রকাশ করিতে পারে, প্রকৃত সরল ব্যক্তি ও প্রণয়ীও তত পারেন না। সুতরাং

জেয়াদের ব্যবহারে মোসলেম কোন রূপ সন্দিহান হইলেন না। জেয়াদ হোসেনের প্রকৃত বন্ধু এবং প্রেমভরেই রাজ্য, সিংহাসন ত্যাগ করিয়া হোসেনকে দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস জন্মিল। তদনুযায়ী স্বীয় মন্তব্য হোসেনকে লিখিয়া পাঠাইলেন।

হোসেন সেই পত্র পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। সমস্ত পরিজনসহ কুফা যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করিয়া হোসেন কুফানগর যাত্রা করিলেন। মদিনাবাসিগণও হোসেনের সঙ্গে সঙ্গে তথায় চলিল। এইরূপে প্রায় যাট হাজার লোক তাঁহার সহযাত্রী হইল। মদিনা হইতে কুফানগর যাইতে যত দিন আবশ্যক, তত দিনের খাদ্য সামগ্রী ও পানীয়জল সঙ্গে করিয়াই তাহারা চলিলেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহারা পথ ভুলিয়া মরুভূমি কারবালা অভিমুখে চলিলেন। জেয়াদের দূত উপযুক্ত সময়ে এই সংবাদ প্রভুকে জানাইলেন। জেয়াদ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া, তাহাকে এজিদ সমীপে প্রেরণ করিলেন।

মরিয়ানের ষড়যন্ত্রে, জেয়াদের সাহায্যে, হোসেন তদীয় মাতামহের সমাধি-মন্দির হইতে স্থানান্তরিত হইয়া, কুফার পথ ভুলিয়া কারবালা অভিমুখে যাইতেছেন শুনিয়া, এজিদ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হোসেন মদিনা হইতে কুফা পর্য্যন্ত যাওয়ার আহারীয় ও পানীয় সংস্থান করিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন। পথভ্রান্তি হওয়ায় তিনি কারবালাভিমুখে চলিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে প্রায় ষাট হাজার লোক। ইহাদের পানীয় সংগ্রহ করা মরুভূমিতে সহজসাধ্য নয়। অতএব শীঘ্র তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ কর। পথি মধ্যে সুযোগ পাইলে আক্রমণ করিবে। নতুবা ফেরাত নদীর কূল এমন ভাবে সংরক্ষিত করিবে যে কোনরূপে তাহারা ঐ নদী হইতে জল সংগ্রহ করিতে না পারে। হোসেনকে যে সংহার কবিবে, অবিলম্বে তাহার মস্তক যে আমাকে দেখাইবে, তাহাকে লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার দিব। এবং বিজয়ী সৈন্যদের জন্য আমার ধনভাণ্ডার খুলিয়া রাখিব। যাহার যত ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পারিবে। কোনরূপ

প্রতিবন্ধক হইবেনা।" এইরূপে উত্তেজিত করিয়া হোসেনের পশ্চাৎ সৈন্য প্রেরণ করিলেন।

হোসেন পথ চলিতে চলিতে যখন কারবালা সীমান্ত প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। এতদিন বিশ্রাম ও পরিশ্রম সহকারে নিশ্চিন্ত মনে গমন করিতেছিলেন, কিন্তু, সেই সীমান্ত দেশে উপস্থিত হইবামাত্র হোসেনের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। মহম্মদ বলিয়াছিলেন "কারবালা প্রান্তে হোসেনের মৃত্যু হইবে।" সেই ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করিয়া হোসেন শমন নিকট জানিলেন।

কারবালার এক দিকে ঘোর অরণ্য, সম্মুখে বিস্তৃত প্রান্তর, জীবজন্তুর সাড়া শব্দ নাই। এই বিস্তীর্ণ মরুভূমি ফেরাতকূলে অবস্থিত। হোসেন এই স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিতে আজ্ঞা দিলেন। শিবির সংস্থাপন করিয়া সকলেই যথাসম্ভব বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

একে মরুভূমি, তাহাতে পথশ্রমে ক্লান্ত, সকলেই পিপাসিত। সঙ্গে যে জল ছিল, তাহাও প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে। ফেরাত নদী কার-

বালার সমীপবর্ত্তী, হোসেন ইহা জানিতেন। কিন্তু, উহার কোন্ দিকে প্রবাহিত তাহা জ্ঞাত ছিলেন না। দাসগণ অনুসন্ধান করিতে করিতে পশ্চিমদিকে স্বচ্ছপ্রবাহিনী ফেরাত নদী দেখিতে পাইল। এজিদ যে সমস্ত সৈন্য সামন্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা অতি দ্রুত বেগে আসিয়া ফেরাত নদীর পূর্ব্ব পার অতি সতর্ক ভাবে রক্ষা করিতেছিল। সুতরাং পিপাসার্ত্ত দাসগণ জল আনয়ন করা দূরে থাকুক, এক বিন্দু জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবৃত্তিও করিতে পারিল না। স্বচ্ছজল সন্দর্শন করিয়া বর্দ্ধিত-পিপাসাযুক্ত-কণ্ঠে, ভগ্নহৃদয়ে কারবালায় উপস্থিত হইয়া যথাযথ বৃত্তান্ত হোসেনকে বলিল।

হোসেন এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। খাদ্যাভাবে ক্ষণকাল জীবন ধারণ করা সম্ভব; কিন্তু, পিপাসা যে মুহূর্ত্ত কালও সহ্য হয় না। সঙ্গে অনেক শিশু সন্তানও আছে, তাহাদেরইবা কি উপায় হইবে। ষাট হাজার লোকের জলাভাব সামান্য বিষয় নয়। কিরূপে জলকষ্ট দূর করিবেন হোসেন

একমনে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে, পিপাসায় অস্থির হইয়া সকলেই হোসেনের নিকট উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিল। শুষ্ককণ্ঠে অনেকে ছট্ ফট্ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। হোসেন অনন্যোপায় হইয়া সকলকে বলিলেন যে, এখন বিন্দুমাত্র জল প্রাপ্তিরও প্রত্যাশা নাই। সেই অনন্ত প্রস্রবণ ভগবানের প্রেমবারি পান করিয়া দেহ মন শীতল কর। এখন প্রাণান্ত হইলেও পরকালে শীতল হইতে পারিবে। ঈশ্বরের নামামৃত পান ভিন্ন এখন আর উপায় নাই, সকলকে এইরূপ উপদেশ দিলেন। তাহারা স্বীয় স্বীয় শিবিরে গমন করিয়া নিবিষ্ট মনে ভগবানের পূজায় নিযুক্ত রহিল।

পরদিন প্রাতঃকালে সর্ব্বত্র এক হাহাকার উঠিল। "আর সহ্য হয়না", "তৃষ্ণায় প্রাণগেল", এইরূপ ভীষণ চীৎকার চতুর্দ্দিক হইতে শূন্যপথে উত্থিত হইতে লাগিল। সে আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া হোসেন আর সুস্থির থাকিতে পারিলেন না, উপাসনা ক্ষান্ত করিয়া সকলকে সান্ত্বনা করিতে

গেলেন। কন্যা, পুত্র ও ছোট ছোট বালক বালি-কারা আসিয়া একবিন্দু সলিলের জন্য তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাড়াইল। হোসেনের স্ত্রী সাহের-বানু দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তানটিকে ক্রোড়ে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "অদ্য সাতদিন যাবৎ একবিন্দু জল পান করিনা। তজ্জন্য স্তনের দুগ্ধ একবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এই সময়ে বাছার কণ্ঠে একবিন্দু জল দিতে পারিলেও বোধহয় বাঁচিতে পারে, অতএব, ইহার জীবন রক্ষার জন্য যদি স্বয়ং যাইয়াও একবিন্দু জল আনিতে পারেন, তবে অন্ততঃ একটী প্রাণও ক্ষণকালের জন্য রক্ষা হয়। অবশেষে জল পিপাসায় শিশুটী প্রাণ ত্যাগ করিবে, ইহা কি প্রকারে সহ্য করিয়া থাকিব।"

হোসেন এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া, শিশু সন্তানটিকে ক্রোড়ে লইয়া ফেরাত নদীর কূলে গেলেন। পার্থিব পদার্থের জন্য জীবনে কখনও প্রার্থনা করেন নাই, তথাপি হোসেন এজিদ সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তো-মাদের মধ্যে যদি কেহ মুসলমান থাক, একবিন্দু জল দান করিয়া শিশুর জীবন রক্ষা কর। জল

অভাবে শিশুটি মৃতপ্রায়। ইহার মুখপানে দৃষ্টি করিয়া দেখ। পিপাসায় জল-দান মহাপুণ্য, তাহাতে এ শিশু। ভাই সকল, অনুগ্রহ করিয়া ইহার জীবন দান কর। আমি সকাতরে তোমাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।"

এজিদ-সৈন্যের হৃদয় পাষাণে নির্ম্মিত। শিশুর স্বর্গীয় প্রভায় তাহাদের মন বিগলিত হইল না। দুগ্ধপোষ্য শিশু তৃষ্ণার্ত্ত ও তজ্জন্য কণ্ঠগত-প্রাণ শুনিয়াও তাহাদের হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্য কোমল হইল না। উহাদের মধ্যে একজন এত নৃশংস যে সে অগ্রসর হইয়া হোসেনকে লক্ষ্য করিয়া সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিল। কিন্তু হায়! কি লিখিব, স্মরণ করিতে বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যায়, উহা হোসেন বক্ষে না লাগিয়া, ক্রোড়স্থ শিশুটির বক্ষ বিদারণ করিয়া পৃষ্ঠদেশ পার হইয়া গেল। হোসেনের ক্রোড়দেশ রক্তে ভিজিয়া গেল। শিশু যন্ত্রণাময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া, পিতা মাতার হৃদয়ে দ্বিগুণ জ্বালা জ্বালিয়া, স্বর্গের সুশীতল সুধাপান করিবার নিমিত্ত অমর ধামে চলিয়া গেল।

হোসেন শিশুর মৃতদেহ ক্রোড়ে করিয়া শি-

বিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এবং স্বীয় সহধর্ম্মিণীর হস্তে উঁহাকে অর্পণ করিলেন। সাহেরবানু শিশুর বুকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া একবারে হতচেতনা হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। এই অভূতপূর্ব্ব শোক সংঘটনে সকলেই ক্রন্দন করিতে লাগিল। কোন ব্যক্তিরই কাহাকে সান্ত্বনা করিবার ক্ষমতা রহিল না। মদিনাবাসীদের মধ্যে ওহাব নামে এক বীর পুরুষ হোসেনের সঙ্গী ছিলেন। তদীয় মাতা হোসেন-পরিবারের ঈদৃশ দুঃখ দেখিয়া পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ওহাব, তোমাকে কি জন্য গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম? এখনও তুমি ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলে না। সাহেরবানুর ক্রোড়স্থ শিশু সন্তানের শোচনীয় মৃত্যু দেখিয়াও তুমি স্থির রহিয়াছ। নয়ন জল বর্ষণ করার কি এই সময়? প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ কর। তোমার কার্য্যে আমি লজ্জিত! তোমাকে ধিক!!"

মাতার ভৎর্সনা বাক্যে উত্তেজিত হইয়া বীরবর ওহাব যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক বিপক্ষ দলকে স্তম্ভিত করি-

লেন। অনেক বিপক্ষ সৈন্য তাঁহার অস্ত্রাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। যে যুদ্ধ করিতে আসে, সেই অচিরে যমপুরী প্রাপ্ত হয়, ইহা দর্শন করিয়া বিপক্ষদল সম্মুখ সংগ্রাম করিতে সাহসী হইল না। দূর হইতে তাহারা ওহাবকে শরদ্বারা বধ করিবার চেষ্টা করিল। ওহাব শত্রু-নিক্ষিপ্ত শরগুলি এড়াইতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে দুই একটী তাঁহার শরীর বিদ্ধ করিয়া রক্ত-প্রবাহ উৎপন্ন করিল। সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, ওহাব শত্রু সংহারেই তৎপর। ক্রমে পরিশ্রম করিতে করিতে অধিকতর পিপাসা-কাতর হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া হোসেনের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং এক বিন্দু জল প্রার্থনা করিলেন।

ওহাব-জননী পুত্রকে প্রত্যাবর্ত্ত দেখিয়া তীব্র স্বরে বলিতে লাগিলেন "কি ঘৃণা! কি লজ্জা!! কেন তুমি আমার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে? সামান্য জল পিপাসাতুর হইয়া, প্রাণরক্ষার্থ শত্রুকে পৃষ্ঠদেশ দেখাইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিয়াছ; অতএব তোমার ঐ কলঙ্কিত মুখ আমি

আর দর্শন করিব না। হয় ফেরাতকূল উদ্ধার করিয়া হাসেনের পরিজন রক্ষা কর, না হয় তাঁহার জন্য তোমার দেহ রণক্ষেত্রে বিসর্জ্জন করিয়া আমার বৃদ্ধ বয়সে তাপিত প্রাণ শীতল কর।”

মাতার ঈদৃশ ভর্ৎসনা ও উৎসাহ বাক্যে উৎসাহিত হইয়া ওহাব পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। স্নেহময়ী জননীর চরণ বন্দনা করিয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণীর নিকট চির বিদায় গ্রহণ করিতে গেলেন। যেমন মা, তেমনি স্ত্রী। তিনি বলিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে অন্তঃপুরের কথা যাহার মনে হয়, সে কেমন বীর? শত্রুকে পৃষ্ঠ দেখাইয়া যে স্ত্রীর মুখ দেখিতে আসে সে বীর নামের অযোগ্য। যদি আপনারা যুদ্ধক্ষেত্রকে ভয় করেন তবে আমরাই কোমল করে অসিধারণ করিয়া রণরঙ্গিণী বেশে সমরক্ষেত্রে যাইতে প্রস্তুত আছি। রণ-সাজে সজ্জিত হইতে আমরাও কুণ্ঠিত হইব না। স্ত্রীর বীরত্বব্যঞ্জক বাক্যে ঈষৎ লজ্জিত ও দ্বিগুণতর উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, ওহাব নক্ষত্রবেগে শত্রুদলে প্রবেশ করিলেন। চতুর্দ্দিক

হইতে তাঁহার প্রতি শর নিক্ষিপ্ত হইল। শরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া শুষ্ককণ্ঠে প্রাণত্যাগ করিলেন। ওহাব-জননী অন্তরালে থাকিয়া স্বীয় পুত্রের রণচাতুর্য্য সন্দর্শন করিয়া পরম প্রীত হইলেন। এবং শোকান্বিতা হইয়া পুত্রহর্ত্তাকে এক আঘাতে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।

ওহাবের মৃত্যুতে হোসেন অত্যন্ত পরিতপ্ত হইলেন। একবিন্দু জল পাইবার জন্য এত আত্মীয় স্বজন নিহত হইল, কারবালা প্রান্তরে শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইল, তথাপি ফেরাত-কূল উদ্ধার হইল না। এইক্ষণ আর বাঁচিবার আশা নাই, আকাঙ্ক্ষাও নাই। এই বলিতে বলিতে হোসেন শোক ভরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

হাসেন-পুত্র কাসেম পিতৃব্যের ঈদৃশ ব্যাকুলতা সন্দর্শন করিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন "তাত, কাসেম এখনও জীবিত; আজ্ঞা পাইলে চিরদাস শত্রুকুল নির্ম্মূল করিবে।"

কাসেম পিতৃহীন বালক। হাসেন মৃত্যুকালে হোসেনের হস্তে তাঁহাকে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন।

তিনি কোন্ প্রাণে তাঁহাকে শত্রু মধ্যে প্রেরণ করিবেন। কিছুতেই স্বীকৃত হইতেছেন না। কাসেমও আগ্রহ পরিত্যাগ করিতেছেন না। অতঃপর হোসেন বলিলেন "বাছা, যাহা কর মাতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া কর।"

এইরূপ আদিষ্ট হইয়া কাসেম হাসনেবানুর পদচুম্বন করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার মাতা অনুমতি প্রদান করিলেন। নানা প্রকার উৎসাহপূর্ণ বাক্যে উত্তেজিত করিয়া, তিনি আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিলেন। কাসেম মাতৃ-আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, হৃষ্টমনে যুদ্ধ-যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, ইতিমধ্যে হোসেন বলিলেন "কাসেম, তোমার পিতার নিকট আমি এক প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি। আমাকে অগ্রে সে সত্য পালন করিতে দাও। তৎপর তুমি সংগ্রামে যাও। মৃত্যুকালে তোমার পিতা আমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছেন, সখিনার সহিত তোমার বিবাহ দিব। উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও, আমার কোন আপত্তি নাই।"

এ সময় বিবাহের কিরূপ উপযোগী বলা নিষ্প্রয়োজন। কারবালা-প্রান্তে তৃষ্ণার্ত্ত হৃদয়ে শত শত লোক মৃত প্রায়, কত বালক বালিকা শুষ্ক কণ্ঠে পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সকলের মুখেই হাহাকার রব। তথাপি পিতৃব্যের আজ্ঞা শিরোধার্য্য মানিয়া, কাসেম সখিনাকে বিবাহ করিলেন। শুভ পরিণয় ব্যাপার কিরূপে সম্পন্ন হইল, সহজেই অনুমান করা যায়। কাহারও মুখে হাসি নাই, পাত্র পাত্রীর পরিণয়োপযোগী অঙ্গরাগ, কি বেশ-ভূষা নাই, মঙ্গল-গানের পরিবর্ত্তে হাহাকার রব, মঙ্গল-বাদ্যের পরিবর্ত্তে রণ-বাদ্য। এইরূপ বিষাদের মধ্যে শুভ পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। কাসেম ও সখিনা পরস্পর স্নেহ-বন্ধনে আজন্ম বাঁধা। নূতন সম্পর্কে প্রণয়-সূত্র আরও দৃঢ়তর হইল। কিন্তু, সে প্রণয় পরিভোগের সময় নাই। যেমনি বিবাহ শেষ, অমনি যুদ্ধার্থে গমন। অসংখ্য শত্রু স্বীয় বাহুবলে বিনাশ করিয়া, সকলকে কাঁদাইয়া, কাসেম যুদ্ধ-ক্ষেত্রে নিহত হইলেন। হোসেন, সাহেরবানু, সখিনা প্রভৃতি শোকার্ণবে নিমজ্জিত হইলেন।

ভ্রাতুষ্পুত্র-শোকে অধীর হইয়া, হোসেন স্বীয় অশ্ব আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। তচ্ছ্রবণে তাঁহার অল্প বয়স্ক পুত্রগণ সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিলেন "পিতঃ, আমরা যদিও শিশু, তথাপি আমরা জীবিত থাকিতে আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে কখনই যাইতে পারিবেন না।" এই বলিয়া প্রথম পুত্র আকবর দ্রুত বেগে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রণ-চাতুর্য্যে শত্রু-পক্ষকে ত্রাসিত করিলেন। যাহাকে সম্মুখে পাইলেন, তাহাকেই শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। এইরূপে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া পিপাসার্ত্ত হইয়া পিতৃ-সন্নিধানে তৃষ্ণা বারণ করিতে জল চাহিলেন। হোসেন জল কোথায় পাইবেন, উপায়ান্তর না দেখিয়া পুত্রকে বলিলেন "আমার জিহ্বা তোমার মুখ মধ্যে নিয়া চোষ, একটু শান্তিলাভ করিতে পারিবে। জিহ্বার রসে তোমার কিঞ্চিৎ তৃপ্তি হইতে পারে।" আকবর তদ্রূপ করিয়া বলিলেন "প্রাণ শীতল হইল। পিপাসা দূর হইল।" ঈশ্বরের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক তিনি আবার সংগ্রামক্ষেত্রে সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। অনেক শত্রু বিনাশ করিয়া তিনি

যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করিয়া স্বর্গবাসী হইলেন।

এইরূপে প্রধান প্রধান যোদ্ধা, আত্মীয়, প্রাণাধিক ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্রগণ একে একে সমরক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিল। তদ্দর্শনে হোসেন অত্যন্ত পরিতপ্ত হইয়া, স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন। সেই বীর পুরুষের বীর-গতির প্রতিরোধ কে করিবে? তাহার অশ্বপদ-ধ্বনিতেই সকলের অন্তরে ভয় সঞ্চার হইল। এজিদের প্রধান প্রধান যোদ্ধাগণ অচিরে হোসেনের অস্ত্রাঘাতে শমনালয়ে প্রেরিত হইল। তদ্দর্শনে আর কেহই হোসেনের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইল না। প্রাণভয়ে সকলে প্রস্থান করিল। হোসেন সমরক্ষেত্রে কাহাকেও না পাইয়া বিপক্ষ দলের শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহার আগমনে সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ দিয়া এদিক ওদিক পলাইতে লাগিল। ফেরাত নদীর কূল উদ্ধার হইল। অনবরত পরিশ্রম করাতে পূর্ব্ব পিপাসা আরো অধিকতর প্রবল হইয়াছিল। হোসেন স্বচ্ছ প্রবাহিণী ফেরাত নদীতে অবগাহন করিয়া উহার স্নিগ্ধ বারি পান করিবার নিমিত্ত অঞ্জলি ভরিয়া জল উঠাইয়া পান

করিবেন, এমন সময় আত্মীয় বন্ধুদের কথা স্মরণ হইল, কাসেমের তৃষ্ণাক্লিষ্ট মুখচ্ছবি হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত হইল, এক বিন্দু জলের জন্য কি প্রকারে আকবরকে কষ্ট করিতে হইয়াছিল সেই কথা, তৃষ্ণার্ত্ত দুগ্ধপোষ্য শিশুর কথা, সমস্তই মনে উদয় হইল। যে জলের জন্য ষষ্ঠি সহস্র লোক কত কষ্ট ভোগ করিয়াছে, পরিজনবর্গ পতিপুত্রহারা হইয়াছে, ফেরাত-কূল উদ্ধার করিয়া তিনি সেই জল পান করিবেন, ইহা তাঁহার সহ্য হইল না। অঞ্জলি হইতে জল নিক্ষেপ করিলেন। তীরে উঠিয়া অঙ্গ হইতে সমস্ত অস্ত্র, বেশ, ভূষা দূরে নিক্ষেপ করিয়া, একাগ্র মনে ঈশ্বর-চিন্তায় নিয়োজিত হইলেন।

অন্তরাল হইতে শীমার প্রভৃতি শত্রুগণ হোসেনের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। হোসেনকে নিরস্ত্র দেখিয়া, তাঁহাকে চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া তাহারা দণ্ডায়মান হইল। যোগ-নিদ্র হোসেন তাহা কিছুই দেখিতে পাইলেন না। শত্রুগণ পশ্চাদ্দিক হইতে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য করিয়া বিষাক্ত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

নিক্ষিপ্ত একটী শরও তাঁহার শরীর বিদ্ধ করিতেছেনা দেখিয়া, অতঃপর শীমার বিশেষ-সন্ধান সহকারে শর নিক্ষেপ করিল। উহা পৃষ্ঠদেশে না লাগিয়া গ্রীবাদেশ বিদ্ধ করিল। তখনও হোসেনের ভ্রূক্ষেপ নাই। মহাপ্রভুর ধ্যানে তিনি আত্ম-হারা।

ক্রমে বিষাক্ত শরের বিষ রক্ত সংযোগে হোসেনের সর্ব্ব শরীরে সঞ্চারিত হইল। তাঁহার বদনকমল নিষ্প্রভ, ও শরীর অবসন্ন হইল। তিনি উত্থান শক্তি রহিত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। শত্রুগণ নিশ্চয় মৃত্যু হইয়াছে অবধারণ করিয়াও কেহ ভয়ে অগ্রসর হইতেছে না। কিন্তু, তাঁহার ছিন্ন মস্তক না দেখাইলে, এজিদ হোসেনের মৃত্যু সংবাদ বিশ্বাস করিবেন না বিবেচনা করিয়া, পাষণ্ড শীমার লম্ফ দিয়া হোসেনের বক্ষোপরি চাপিয়া বসিল। তখনও হোসেনের জীবন শেষ হয় নাই। বক্ষোপরি ভার পড়াতে শ্বাসরোধ হইয়া হোসেন অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইতে লাগিলেন। শীমার খঞ্জর নামক অস্ত্র দ্বারা তাঁহার গলদেশ ছেদন করিবার জন্য যত বার

চেষ্টা করিল, ততবারই তাহার প্রয়াস ব্যর্থ হইল ; এক চুলও খঞ্জর প্রবেশ করাইতে পারিল না। অতঃপর হোসেন বলিলেন, "ভাই শীমার, আর কেন, এখনই আমার প্রাণ শেষ হইবে, বিষে শরীর জর্জ্জরিত হইয়াছে, নামিয়া বস, আমাকে নিশ্বাস ফেলিতে দাও।" শীমার বলিল "তোমার মস্তক দেহ-বিচ্ছিন্ন না করিয়া আমি বক্ষ হইতে অবতরণ করিব না।" বক্ষোপরি বসিয়া অনেক চেষ্টার পর, যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিয়া, শীমার হোসেনের মস্তক দেহ-বিছিন্ন করিল। মহাবীর আলীর পুত্র, মদিনার রাজা, ভগবদ্ভক্ত এমাম হোসেন নিরস্ত্র অবস্থায় শত্রু-হস্তে প্রাণ ত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন। স্বর্গ মর্ত্ত্য ভেদ করিয়া, চতুর্দ্দিক হইতে "হায় হোসেন!" "হায় হোসেন !!" "হায় হোসেন !!!" বিলাপ-ধ্বনি উত্থিত হইল। শত শত বৎসর চলিয়া গেল ; কিন্তু সে করুণ ধ্বনি অদ্যাপি নিবৃত্ত হইল না। কত জাতির অভ্যুত্থান ও পতন হইল, কত কত যোদ্ধা দিগ্বিজয়ী হইয়া কালক্রমে বিস্মৃতির অতল সাগরে নিমগ্ন হইলেন, কিন্তু

যতই সময় অতিবাহিত হইতেছে, ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষ হাসেন হোসেনের স্মৃতি ততই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া মানব জাতির হৃদয়-রাজ্য আলোকিত করিতেছে, এবং জাতি নির্ব্বিশেষে মানবের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিতেছে। তাঁহাদের বিষাদময় পরিণতি স্মরণ করিয়া অদ্যাপি মুসলমানগণ বৎসর বৎসর "হায় হাসেন!" হায় হোসেন!!" রবে জগৎকে কাঁদাইতেছে; উন্মত্ত করিতেছে।

সম্পূর্ণ।